মহামন্বন্তর

শ্রীপরিমল গোস্বামী
সম্পাদিত

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড্
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রকাশক: শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিন্টার্স র‍্যান্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—মার্চ ১৯৪৪
নূতন আকারে পুনর্মুদ্রণ—সেপ্টেম্বর ১৯৪৪
মূল্য তিন টাকা

জেনারেল প্রিন্টার্স র‍্যান্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস এম-এ. কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

মন্বন্তর শেষ হয়নি, মহামারী তার জের টেনে চলেছে; হয়ত দ্বিতীয় মহামন্বন্তরেরও আয়োজন হচ্ছে। তবু চোখের উপর আমরা যে শ্মশান দৃশ্য দেখেছি তার কোনো আভাস কি বহন করবে না আমাদের কালের কোনো ইতিহাস? দু'একটি প্রয়াস তার হয়েছে, ইংরেজিতে ও বাংলায়। সে প্রয়াস দেখে কেবলই মনে হয়—কত সত্য, কিন্তু কত অসম্পূর্ণও।

আসলে এই মন্বন্তরকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে পারেন ঐতিহাসিক নয়, স্রষ্টা। তাঁর দৃষ্টিতে ভুল থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে তবু একটি সম্পূর্ণতার স্বাক্ষর থাকবেই।

বাংলাদেশের মন্বন্তর তার শিল্পীদের মনে যে কত বড় আলোড়ন তুলেছে, মন্বন্তরের মধ্যে বসেও আমরা তা সবিস্ময়ে দেখেছি, আর স্বীকার করেছি—বাংলার শিল্পী ও সাহিত্যিকরা তাঁদের দায়িত্ব বিস্মৃত হননি। শিল্পের পক্ষেও এ এক শুভ লক্ষণ যে, শিল্পীরা তার আঘাতে সত্যনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছেন, তাঁদের দৃষ্টি বস্তুনিষ্ঠ হ'য়ে উঠছে।

কোনো একটি সংগ্রামে সাহিত্যিকদের এই চিত্রমালা দেখতে অনেকেই আমরা উৎকণ্ঠিত হ'য়ে ছিলাম। কারণ, আমাদের কর্মী ও নেতারা যা বলতে পারেননি, আমাদের শিল্পীরাই সেই মন্বন্তরের কথা এখন পর্যন্ত তবু বলতে পেরেছেন। পরবর্তী কালে হয়ত সার্থক শিল্পী এই মন্বন্তরকে আরও স্থির দৃষ্টিতে দেখতে পারবেন, স্থিরতর চিত্তে তার রসরূপ দিতে পারবেন, কিন্তু বেদনার যে তীব্রতা, যে নিষ্ঠুরতা, যে সুগভীর মনস্তাপ এই সমসাময়িক লেখকদের চেতনাকে অস্থির ও বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছে তা বোধ হয় ভবিষ্যৎ শিল্পীরা এমন ক'রে উপলব্ধি করতে পারবেন না। হয়ত সে ইঙ্গিতও তাঁদের গ্রহণ করতে হবে এইরূপ সমসাময়িক চিত্র-উপকরণ থেকেই—সমধর্মী শিল্পীদের চেতনায় এই মন্বন্তর কি দাগ রেখে গেছে তা থেকেই।

'মহামন্বন্তর'-এর এই চিত্র-সংগ্রহকে আমরা তাই সাগ্রহে গ্রহণ করছি। ইতিহাসের স্বাক্ষর এর পাতায় পাতায়, সাহিত্যেরও নতুন স্বীকৃতি এর সকল কাহিনীতে।

শ্রীগোপাল হালদার

নিবেদন

১৯৪৩ সাল বাংলাদেশের বুকে যে বিপর্যয় বহন ক'রে এনেছে তার তুলনা বাংলাদেশের ইতিহাসে আর মেলে না। আমরা এই বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে এখনও চলছি এবং যদি কখনও সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হ'তে পারি তাহ'লে তখন এর ভয়াবহতা হয়তো আরও বেশি ক'রে উপলব্ধি করতে পারব।

এদেশে একবার মন্বন্তর ঘটেছিল, এবারে ঘটল মহামন্বন্তর। এক দিকে পথে পথে ক্ষুধার্ত নরনারীর মিলিত আর্তনাদ, অন্য দিকে খবরের কাগজে সভায়-সমিতিতে তার প্রতিধ্বনি। চোখের সম্মুখে রাজপথের উপর লোক মরছে, পথে পথে মৃতদেহ পড়ে আছে, মা মৃতশিশুকে কোলে নিয়ে কাঁদছে, স্ত্রী স্বামীর মৃতদেহের পাশে কাঁদছে, কলকাতা শহরেই এই ভয়াবহ দৃশ্য দিনের পর দিন আমরা দেখেছি; আর তার সঙ্গে দেখেছি এই হতভাগ্যদের ফোটোগ্রাফ, মৃত ও মুমূর্ষুর বীভৎস সব ছবি, সর্বত্র একই ধরনের ছবি, যেমন পথে পথে একই ধরনের কান্না আর একই ধরনের মৃত্যু।

ব্যাপারটি এমনই কল্পনাতীত, এমনই আকস্মিক যে প্রথমে এ দৃশ্য চোখে দেখলেও কারও ঠিক মতো বিশ্বাস হয়নি। প্রথমে এল গৃহ-সংসার ভেঙে দিয়ে পল্লীবাসীরা। এসে চালের দোকানের সম্মুখে "কিউ" ক'রে দাঁড়াল। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, বসল। শেষে বসতেও পারল না শুয়ে পড়ল। চব্বিশঘণ্টা পথের উপর অপেক্ষা ক'রে থাকলে তবে কন্‌ট্রোলের দোকানে সকালে দু'সের চাল মিলতেও পারে। রৌদ্রে বৃষ্টিতে পথের উপর পশুদলের মতো জীবন্মৃত নরনারীর ভিড় জমে গেল। যারা ম'রে গেলেও পথে বেরিয়ে আসতে পারেনি তাদের কি দুর্দশা হ'ল তা জানা গেল না।

এই অতি অপ্রত্যাশিত আকস্মিক দৃশ্যে লোকে হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারেনি। সর্বনাশ যত বড়ই হোক তার আকস্মিকতা অনেক সময়েই হাস্যকর হ'য়ে ওঠে। স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ দলে দলে হঠাৎ পথের ক্ষুধার্ত রুগ্ন কুকুরের মতো ব্যবহার করছে, ডাস্টবিন থেকে খাদ্য সংগ্রহ করছে, এ দৃশ্য আমাদের অভিজ্ঞতাকে হঠাৎ ধাক্কা মেরে হাস্যরসের সৃষ্টি করে। তারপর ধীরে ধীরে বোঝা যায় সে কি মারাত্মক রকমের হাস্যকর। অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই তা বোঝা গেল। আরও বোঝা গেল, এই সর্বনাশ কোনো বিশেষ একটা জায়গায় ঘনীভূত নয়, সমস্ত শহরে ব্যাপ্ত, সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত। এই ব্যাপক সর্বনাশের দৃশ্য আর তার ফোটোগ্রাফ দেখে দেখে,

দুই

এ বিষয়ে সর্বত্র আলোচনা শুনে শুনে আমাদের মনে বেদনার তীক্ষ্ণতা এল কমে, বেদনা ব্যাপক হ'য়ে সমস্ত মনকে ভারী ক'রে তুলল; মৃতদেহ দেখে আর মুমূর্ষুর আর্তনাদ শুনে মন অসাড় হ'য়ে এল। অসাড় মন বাইরে প্রসারিত হয় না, নিজেরই মধ্যে ডুব মারে। এ অবস্থা গল্প লেখার অনুকূল নয়। কেননা বাস্তবকে কোনো রকমে অনুকরণ করলেই গল্প লেখক নিষ্কৃতি পান না। নির্বিশেষ থেকে বিশেষকে বেছে নিয়ে তাঁকে গল্প রচনা করতে হয়; কিন্তু মন যেখানে বিমুখ, সেখানে কোনো কিছু গ'ড়ে তোলা সম্ভব নয়।

তা ছাড়া ব্যাপক নির্বিশেষ থেকে বিশেষকে বাছাই ক'রে আনলেও আমরা যে-বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করছি, লেখক কোন্ ভাষায় তাকে পৃথক ভাবে দর্শনীয় ক'রে তুলবেন? যে সর্বনাশের দৃশ্য চোখ মেললেই সকল ইন্দ্রিয়ে এসে নির্মমভাবে ঘা দেয়, এমন কোন্ ভাষা আছে যার সাহায্যে সেই দৃশ্যের অনুকরণে আর একটি দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা যাবে?

ভাষা পরাজিত, অনুভূতি অসাড়, অন্তর বিমুখ, মনে শুধু বিষের তিক্ততা। এই তিক্ততা নিয়ে লেখককে কলম ধরতে হয়েছে, এবং অনেক গল্পে এই তিক্ততাই বেশি ক'রে ফুটে উঠেছে। এর মধ্যেও যিনি বহু প্রয়াসে নিজেকে ক্ষণকালের জন্য মুক্ত ক'রে আনতে পেরেছেন, তাঁর লেখা, গল্পের সার্থকতা বেশি পেয়েছে, যদিও এই সার্থকতার সঙ্গে এই গল্পগুলোর ভাল-মন্দ নির্ভর করছে না। কেননা, এই প্রলয়ের পটভূমিতে যিনি যে ভাবে কিছু দাঁড় করাতে পেরেছেন তাঁর গল্পেরই একটা বিশেষ সার্থকতা ফুটে উঠেছে। বিচলিত মন নিয়ে অনেক লেখক তো এ বিষয়ে কিছু লিখতেই পারেননি।

একই পটভূমিতে লেখা এতগুলো গল্প এক সঙ্গে প্রকাশের সার্থকতা আরও বেশি। সর্বনাশের স্রোতে তৃণখণ্ডের মতো ভেসে যাওয়া অগণিত নরনারী—তাদের অকালমৃত্যুর আগে সমাজের কাছে কি চেয়েছিল, কি পায়নি; ভাগ্যবানের দুয়ারে কিসের আশায় এসে কেঁদেছিল, কেঁদে কি ফল হ'ল; পথের পাশে মায়ের বুকের শুষ্ক স্তন টানতে টানতে যে শিশুর ক্ষীণ আয়ুশিখা নিবে গেল, আমাদের উপর সে শিশুর দাবী আমরা কতটুকু পূরণ করেছি; মৃত সন্তান বুকে নিয়ে যে-মা কাঁদতেও পারল না, তার মর্মচ্ছেদী মূক বেদনা কার প্রাণে কতটুকু সাড়া জাগাল; যে নিজহাতে ধান ফলাল, একটুখানি ফেনের দাবীও তার ছিল কি না; যাদের সেবার ভিত্তিতে

সমাজ সচল, সমাজ তাদের সর্বনাশে কতটুকু বিচলিত হ'ল, তার কিছুটা অনুভব করা যাবে এই গল্পগুলোর ভিতর দিয়েই। কারণ গল্পের ভিতর দিয়েই ঘটনা জীবন্ত হ'য়ে ওঠে, পরিপূর্ণতা পায়, এবং গল্পের ভিতর দিয়েই সে তার মর্মকথা প্রকাশ করে। সুতরাং বিশুদ্ধ গল্প মূল্য ছাড়াও দুর্ভিক্ষের মর্ম-ইতিহাস হিসাবে এর একটা অতিরিক্ত পৃথক মূল্য আছে এবং সেইখানেই 'মহামন্বন্তর'-এর বিশিষ্টতা।

বাংলার বুকে একদিন মহাপ্রলয় নেমে এসেছিল সে কথা বাংলার ইতিহাসে চিরদিন লেখা থাকবে। কি কারণে এই প্রলয় ঘটেছিল তারও বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই বর্ণনায় ভবিষ্যতের লোকের কাছে আজকের এই প্রয়ল-চিত্র কখনও জীবন্ত হ'য়ে উঠবে না, উঠবে এই গল্পগুলোর ভিতর দিয়েই।

কিন্তু ছোট গল্পের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, তার মধ্যে খণ্ড জীবনের আংশিক ছবি মাত্র পাওয়া যায়, তার পরিধি স্বভাবতই ক্ষুদ্র, কিন্তু এই বইতে সংগৃহীত বিভিন্ন লেখকের সবগুলো লেখা এক সঙ্গে পড়লে মোটামুটি একটা বড় পরিধির ছবি পাওয়া যাবে, কারণ প্রত্যেকেই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে সমগ্র জিনিসের এক একটা পৃথক অংশ বেছে নিয়েছেন।

'মহামন্বন্তর'-এর গল্প সংগ্রহের আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে এর প্রত্যেকটি কাহিনীই চোখে-দেখা ঘটনা থেকে লেখা। অবশ্য গল্পের উৎকর্ষ-অপকর্ষ 'সত্য' ঘটনার উপর আদৌ নির্ভর করে না, দুর্ভিক্ষ না থাকলেও দুর্ভিক্ষের করুণতম ছবি ফুটিয়ে তোলা চলে। করুণ ছবি আঁকতে চোখে-দেখা ঘটনা অপরিহার্য নয়, বরঞ্চ নিজের মন থেকে প্লট গড়ে তুললে গল্পকে ইচ্ছামতো বেশি করুণ করা চলে। তবু যে এই গল্পগুলোতে ট্র্যাজেডি ফুটে উঠেছে তার কারণ লেখকগণ চোখে-দেখা ঘটনার ট্র্যাজেডি থেকেই তাঁদের গল্পের প্লট সংগ্রহ করেছেন, অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের ট্র্যাজেডিই তাঁদের গল্প লেখায় অনুপ্রাণিত করেছে।

তবু সাধারণভাবে অধিকাংশ গল্পই ছবি মাত্র, অসহায় মানুষের নীরব দুঃখভোগের নিপুণ চিত্র মাত্র, আলোছায়ায় পাশাপাশি বিন্যাস মাত্র, লেখকদের দৃষ্টি এ ছবি ভেদ ক'রে আরও গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি—কেননা প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি, লেখকেরা নিজেরাই মানুষের দুঃখভোগের বিরাটত্বের সম্মুখে সাময়িকভাবে অভিভূত হ'য়ে পড়েছেন।

বর্তমান বিপর্যয় নিয়ে উপন্যাস লেখা হয়নি তার কারণ উপন্যাস

লেখার সময় এখনও আসেনি। প্রলয়-কালের মধ্যে বাস ক'রে ছোট গল্প যদি বা লেখা চলে, কেননা, ছোট গল্পে জীবনের সমগ্রতা ফুটিয়ে তোলার দরকার হয় না; উপন্যাস লেখা চলে না, কারণ উপন্যাসে একটা বৃহৎ পরিধির সমগ্রতা ফুটিয়ে তুলতে হয়। সৌরজগতের মধ্যে বাস ক'রে অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের গতি অথবা তাদের সম্পর্কে পৃথিবীর গতি প্রত্যক্ষ করা যায় এবং সে বিষয়ে কাহিনী লেখা চলে, কিন্তু সমগ্র সৌরজগতেরও যে একটা গতি আছে তা প্রত্যক্ষ করতে হ'লে লেখকের মনকে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের গতি থেকে সরিয়ে নিতে হয় সৌরজগতের বাইরে। বর্তমান বিপর্যয় সম্পর্কেও সে কথা সত্য। এ বিপর্যয়ের এখনও কোনো সীমা নির্দিষ্ট হয়নি, কাজেই এ থেকে লেখক-মন এখনও দূরে স'রে যেতে পারছে না। তা ছাড়া এর ফল কতদূর বিস্তৃত হবে, বাংলার সমাজ-জীবনে এর প্রতিক্রিয়া কি হবে তা এখনও আমাদের অজ্ঞাত। এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করাও নিরাপদ নয়।

এই প্রলয়কালে একটি মাত্র নতুন ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গেল। মুমূর্ষু মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দুটো ভাত বা একটু ফেনের জন্য দৈবশক্তির উপর নির্ভর করেনি, সে হাত পেতেছে মানুষেরই কাছে। মৃত্যুকাল পর্যন্ত সে বিশ্বাস করেছে একা মানুষই তাকে বাঁচাতে পারে। গল্পগুলোর মধ্যেও মুখ্যভাবে বা গৌণভাবে সেই বিশ্বাসেরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যাচ্ছে। কোনো লেখকই নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে কারও মনে ভবিষ্যৎ দৈব-অনুগ্রহ বা দৈব-বিচারের আশা জাগিয়ে তোলেননি। মনোজগতে কতখানি বিপ্লব ঘটলে এটা সম্ভব হয় তা হয়তো এখনই অনুমান করা যেতে পারে।

পরিশেষে বক্তব্য, এই গল্প সংগ্রহের বিশেষ মূল্য উপলব্ধি ক'রে লেখকগণ সহজেই এতে তাঁদের গল্প প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন, এবং এজন্য তাঁদের কিছু ত্যাগ স্বীকারও করতে হয়েছে। সেজন্য প্রকাশকের পক্ষ থেকে আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

'মহামন্বন্তর'-এর সবগুলো গল্পই ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের চরম অবস্থার সময়ে রচিত এবং পূর্ব-প্রকাশিত। গল্পগুলো লেখকদের নামের বর্ণানুক্রম হিসাবে পর পর ছাপা হ'ল।

কলিকাতা — শ্রীপরিমল গোস্বামী

মার্চ ১৯৪৪

— মহামন্বন্তরে আছে —

বাংলার অন্নহীনের হাহাকার জাতিধর্মনির্বিশেষে যাঁকে অক্লান্ত

অন্নদান সেবায় দীক্ষিত করেছে,

যাঁর মুখে ভাষাহীন আর্ত বাংলার বাঁচার অধিকার বজ্রনির্ঘোষে

ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে,

যাঁর পৌরুষ মুমূর্ষু বাংলাকে গৌরবহীন মৃত্যুর হাত থেকে

ছিনিয়ে আনার মহৎ কাজে নিযুক্ত,

সেই পরম শ্রদ্ধেয় দেশপ্রেমিক

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে

মহামন্বন্তর

উৎসর্গ করা হ'ল।

কালনাগ

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ভবতোষ চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেল, আত্মহত্যা। আত্মহত্যা ছাড়া কোনো পথ নেই সমাধানের। পরাজয়-মোচনের।

সমস্ত রাত ছটফট করেই তার কাটতো যদি না শেষ রাতের দিকে চাঁদ উঠতো পীত-পাণ্ডু। চাঁদ দেখে তার আশা হলো একবার, এই বুঝি আকাশ ছিঁড়ে যাবে বন্য চীৎকারে আর দেখতে না-দেখতে সে তার সমস্ত নিয়ে আগুনে অঙ্গার হয়ে উঠবে। তার সমস্ত অর্থ—তার লজ্জা, তার দৈন্য, তার সাহসহীনতা। তার এই আনর্থক্য।

কিন্তু আজকের চাঁদ আতঙ্কের চাঁদ নয়, ঘুম পাড়াবার চাঁদ। একটু ঘুমুলোই না-হয় ভবতোষ। কাল যে আত্মহত্যা করবে চাঁদের বৈমুখ্যে আজকে তার নালিশ না করলেও চলে।

ভবতোষ সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়লো। অন্তত খানিকক্ষণের জন্যে ভুললো যে কাল তাকে আত্মহত্যা করতে হবে। ভুললো, তিন দিন ধরে আধপেটা খাচ্ছে, সাত দিনের উপর সে ঘুমুতে পাচ্ছে না, এক মাসেরো উপর পরনে তার একটা আস্ত কাপড় নেই। ভুললো, সংসারে যে চিনির পাট নেই, জুতোর হাঁ-টা যে বোজানো যাচ্ছে না, কয়েক দিন আগে একমাত্র লেখবার টেবিলটা যে পোড়াতে হয়েছিল কয়লার অভাবে। ভুললো তার অসহায় স্ত্রী, অসহায়তর শিশুগুলি। ভুললো সে ইস্কুলমাস্টার।

সংকল্পের উত্তাপের দরুণ তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙলো ভবতোষের। দিনের আরম্ভটি কেমন যেন নতুন লাগলো।

নতুন লাগলো, সুধার কাংস্য-কর্কশ কণ্ঠস্বর অনেকক্ষণ শোনা গেল না। তার অগণিত অভিযোগের তালিকা। তবে কি ঘটেছে কিছু অভূতপূর্ব? শোঁকা যাচ্ছে কি উনুনের ধোঁয়া?

ভবতোষ নেমে এলো তক্তপোষ ছেড়ে। নিচে মেঝের উপর গড়াচ্ছে এখনো শিশুগুলি, সুধার জায়গাটা শুধু ফাঁক। যেখানে ঘুম মানে বিস্মরণ সেখানে এত ভোরে ওঠবার মানে কী? আর উঠলোই যদি, নিজেকে সে জানান দিচ্ছে না কেন?

ছাত নেই, ভবতোষ তাই খুঁজলো একতলাতেই। কোথাও সুধার

ঠিকানা পাওয়া গেল না। রান্নাঘর থেকে কলতলা—কতটুকুই বা জায়গা—ঘুরে-ঘুরে বারে-বারে ভবতোষ দেখতে লাগলো, কোথাও সুধা নেই। হঠাৎ তার চোখে পড়লা সদরের খিল খোলা।

একটা ছুরির ফলা ভবতোষের বুকের মধ্যে যেন দাগ কেটে দিল—তবে কি সুধা ঘরে নেই? দরজা খুলে গলির মোড় পর্যন্ত ব্যস্ত হয়ে সে ঘুরে এলো, একটা ঝাড়ুদারণী ছাড়া দ্বিতীয় স্ত্রীলোক দেখা গেল না।

ভবতোষ কি পাগল না অসং যে স্ত্রীকে অসতী ভাববে? নিশ্চয়ই আছে কোথাও বাড়ির মধ্যে। সদরে খিল দেয়া নেই, মানে দিতে ভুলে গিয়েছিল।

ফিরলো ভবতোষ। ঢুকলো শোবার ঘরে। ছেলেমেয়েগুলো তেমনি ঘুমে, কিন্তু ওদের মা কোথায়? চেঁচিয়ে ডাকা যায় না, তবু ডাকলো দু'বার সুধা ব'লে। তক্তপোষের তলাটা শুধু দেখতে বাকি ছিল, তাও দেখলো।

বাইরে যদি-বা গেছে, নিশ্চয়ই সেটাকে বাইরে বলে না। ফিরে আসবে এখুনি। রোদ ওঠবার আগেই। কিন্তু তাকে না ব'লে প্রায়-রাত-থাকতে সদর খুলে সে বাইরে যাবে সেটাই বা কোন্ দিশি? রোজই যায় নাকি এ রকম?

কোনো কিছু হদিস রেখে গেছে কি না ভবতোষ তাই খুজতে লাগলো ব্যস্ত হাতে। তক্তপোষে তার তোষকের তলাটাই হচ্ছে সুধার চিঠিপত্র রাখার জায়গা। উলটে পালটেও কোনো খেই পেল না কিছুর। শুধু সুধার নিজের বালিশের নিচে চাবির গোছাটা পড়ে আছে। বুকটা কেঁপে উঠলো ভবতোষের—চাবি যখন নেয়নি আঁচলে বেঁধে, তখন সে বুঝি আর ফিরে আসবে না।

চাবি দিয়ে ভবতোষ সুধার হাতবাক্সটা খুলে ফেললো। যা ভেবে-ছিলো সে। সুধা আর নেই। সুধা তার হাতের দু'গাছি সোনার চুড়ি হাতবাক্সে রেখে গেছে।

ঐ দু'গাছি সোনার চুড়িই সুধার শেষ আভরণ। আর বাকি যা-কিছু ছিল কাগজের টুকরোয় পর্যবসিত হয়ে জঠরের আগুনে ভস্মসাৎ হয়ে গেছে। ঐ দু'গাছি রেখে দিয়েছিল সে আয়তির চিহ্ন হিসেবে তত নয়, যত, একটা-কিছু বড় রকমের বিপদ-বিশৃংখলার হাত এড়াতে। যদি বোমা পড়ে কোলকাতায় আর তাদের চলে যেতে হয় সহর ছেড়ে তবে ঐ দু'গাছি

সোনার চুড়িই হয়তো তাদের কিছু দূরের পথ দেখাবে। তাই সব সময়ে হাতে রেখেও তাতে হাত দেয়নি সে কোন দিন। সেই চুড়ি দু'গাছ আজ তার হস্তচ্যুত! কী মানে দাঁড়ায় এর?

স্পষ্ট, অবধারিত। সুধাই গেছে আত্মহত্যা করতে। ভবতোষের আগে, ভবতোষকে কলা দেখিয়ে। তার পতিব্রতীত্ব বজায় রেখে।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো ভবতোষ রাস্তায় বেরিয়ে গেল। ছেলেমেয়েরা ঘুমুচ্ছে, ঘুমোক। যতক্ষণ না জানতে পারে। যতক্ষণ না জানতে পারে ক্ষুধার দগ্ধশলাকা।

কোথায় যেতে পারে সুধা? কোথায় আবার? গঙ্গায় নিশ্চয়। এখন জোয়ার এসেছে গঙ্গায়। আর সুধা সাঁতার জানে না। সন্দেহ কী!

বেশি দূরে নয় গঙ্গা। গলি থেকে বেরিয়ে ডান দিকে খানিক গিয়ে মোড় ঘুরলেই। প্রায় ছুটতে ছুটতে ভবতোষ পৌঁছুলো গঙ্গার ঘাটে। এ-ঘাট থেকে ও-ঘাটে। ভিড় জমেছে প্রাতঃস্নাতকদের। কোথাও সুধার উদ্দেশ পাওয়া গেল না। না ঘাটে না জলে।

ভীষণ হৃতবল মনে হ'তে লাগলো ভবতোষের। নিরাশ, নিরুৎসাহ। সে পারলো না আগে মরতে। সে পারলো না বাঁচিয়ে রাখতে তার আত্ম-হত্যার ইচ্ছা।

ফের ফিরতে হয় বাড়ি। কে জানে, হয়তো ফিরেই দেখতে পাবে সুধাকে। গঙ্গা থেকে স্নান ক'রে বাড়ি ফিরেছে ভেজাচুলে। উনুন ধরিয়েছে। কিন্তু, তারপর, রাঁধবে কী? চা'ল কই?

তবু সে ফিরছে, এই লালসাটি লালন করেই ভবতোষ এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করলো। দেরি করলো খানিকক্ষণ। যেন ফিরতে সময় দিল সুধাকে।

হয়তো মন থেকে আত্মহত্যার ইচ্ছাটাকে তুলে ফেললেই সুধাকে ফিরে পাবে সে। হঠাৎ এই জনপ্রবাহকে ভালো লাগলো তার, ভালো লাগলো রোদের প্রথম ঝাঁজ, খানিক পরে ফের মেঘলা হয়ে যাওয়া। সুন্দর ব'লে মনে হলো সুধাকে। তার শরীরের ঠামটি মনে হলো এক টানে একটি লাবণ্যের রেখাঙ্কন। মৃত্যুর থেকে মুখ ফিরিয়ে আনতেই সাধ হলো সুধাকে স্পর্শ করে।

বাড়িতে যে-চমক সে দেখবে ব'লে আশা করেছিল তা দেখলো সে ছোট দুটোর কান্নায় আর বড়টার রুদ্ধ-শোক গাম্ভীর্যে। বড়টা মেয়ে,

সাবিত্রী, বয়েস দশ। ছোট দুটো ছেলে। সর্বশেষটা তিন বছরের। মাঝখানে দুটো কাটা পড়েছে।

'কি মা কোথায়?' ভবতোষ জিগ্‌গেস করলো সাবিত্রীকে।

'বা, তোমরা তো এক সঙ্গেই গেলে। তোমার সঙ্গেই তো মার ফেরবার কথা।'

'কী যে বলিস। আমি তো গেছলাম তাকে খুঁজতে। কোথাও দেখতে পেলাম না।'

সাবিত্রী স্তম্ভিত হয়ে রইলো। ছোট দুটো খানিক থেমে আবার উচ্চে তান তুললো। সবাইর ধারণা ছিল বাবা আর মা এক সঙ্গেই ফিরে আসবে। কিন্তু বিপদের এমন চেহারাটা তারা কল্পনাও করতে পারেনি।

একটা হতবুদ্ধিকর ঘটনা। কোথায় যাবে, কী করবে, ছেলেমেয়ে-গুলোকে কী প্রবোধ দেবে কিছুরই কিনারা করতে পারে না ভবতোষ। আর এটা এমন একটা হৈ-চৈ করবার মতোও ঘটনা নয়, ঢাক পিটিয়ে রাষ্ট্র করা যায় না। মৃতদেহ না পাওয়া পর্যন্ত কেউ বিশ্বাস করবে না আত্মহত্যা বলে। মুখে যাই বলুক, ঢোল পিটবে মনে মনে। তার চেয়ে গলায় দড়ি বেঁধে সিলিঙের কড়ায় ঝুলে থাকলেও যেন এমন কেলেঙ্কারি হতো না। একটা প্রমাণের আরাম পেত অন্তত।

কাউকে বলা যায় না, তবে কী ব্যবস্থা করবে ছেলেপিলেগুলোর? কী খেতে দেবে তাদের? ইস্কুলেই বা সে যাবে কখন? তারপর, জোগাড় হয়েছে সন্ধ্যেয় একটা নতুন টিউশনি, তারই বা কী হবে? সর্বত্র রাষ্ট্র না করেই বা কী উপায়!

সূর্য মুহ্যমান হয়ে এলো পশ্চিমে, তবু সুধার দেখা নেই। অঙ্কের মাস্টার কাশীনাথবাবু পাড়ায় থাকেন, তাঁরই বাড়িতে ছেলেমেয়েগুলোর খাওয়া হলো এ বেলা। তবু একটা ওজুহাত জুটেছিল তাদের অদৃষ্টে। ভবতোষ অভুক্ত। হয়তো সেই একই ওজুহাত।

কিন্তু কাল? কাল কি তার শূন্য হাঁড়ির খবর সে চেপে রাখতে পারবে? কিন্তু কালকের মধ্যেই কি সুধার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যাবে না?

সন্ধ্যের টিউশনিটা যে খোয়া যাবে এই ভবতোষের দুঃখ। ছাত্রের বাপ ভীষণ কড়া, পাঁচ মিনিট দেরি হলেই মাইনে কাটবার ভয় দেখায়, গোটা

একদিন কামাই করলে বরখাস্ত করবে। কোনো কিছুই তো জানতে সুধার বাকি ছিল না।

শুধু টিউশনিটাই বা কেন? তার অবোধ ছেলেমেয়ে, তার অযোগ্য স্বামী, তার ছন্নছাড়া সংসার।

বাড়িতে বাতি জ্বালবে কি না ভবতোষ ভাবছিলো, দেখলো কে আসছে গলি দিয়ে। নির্ভুল মেয়ে-ছেলে। পরনে খাটো ফেঁসে-যাওয়া নোংরা কাপড়—পাড় আছে কি নেই চোখে পড়ে না—হাত-গলা সব খালি, এক হাঁটু ধুলো। যেন দাঁড়াতে পাচ্ছে না এমনি তার চলা, হাতে আবার একটা পুঁটলির ভার। ভবতোষ বেরিয়ে এলো রোয়াকের উপর। সুধাই তো সত্যি।

কী যে হতে পারে সুধার, নিশ্বাস নিতে-নিতে কিছুই ভেবে উঠতে পারলো না ভবতোষ। কাছে এলে শুধু জিগ্‌গেস করলে, 'এ কী?'

সুধা বললো, 'চাল।'

'চাল?' যেন ভবতোষ কোনোদিন নাম শোনেনি ও জিনিসের।

'হ্যাঁ, দু'সের চাল পেয়েছি।' সুধা হাসলো। অসীম ক্লান্তির মাঝেও যেন জয়ের একটু স্পর্ধা আছে লেগে।

যেন বহু দূর পথ পার হয়ে ভিক্ষে ক'রে কুড়িয়ে এনেছে এমনি মনে হলো ভবতোষের। বললে, 'পেলে কোথায়?'

'কনট্রোলের দোকান থেকে। রাত থাকতে গেছি আর ফিরছি এই সন্ধ্যেয়। তোমরা না জানি কত উতলা হয়েছ,' সুধা হাসলো অন্তরের স্বচ্ছতায়: 'কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছিলাম চাল না নিয়ে বাড়ি ফিরবো না কিছুতেই। তাই মাঝখানে দোকান বন্ধ হয়ে গেলেও লাইন ছাড়ি নি। কত ধাক্কাধাক্কি, কত ধ্বস্তাধ্বস্তি, তবু টলি নি এক পা, মাথার উপর তুমুল এক পশলা বৃষ্টি পর্যন্ত হয়ে গেল। ষোলো ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে পেলাম তবে এই দু' সের। উঃ, আমি তো কত লোকের ঈর্ষার বস্তু, কত লোকেই তো কিছু পায় নি, যারা দাঁড়িয়েছিল আমার পিছনে। পুরুষের লাইনেও তাই। আমিও নিলুম, আর বললে, ফুরিয়ে গেছে।'

'কিন্তু এমন একটা বিশ্রী পোষাকে গিয়েছিলে কেন? হাত-পা খালি, পরনে আমার তেল-মাখবার ধুতিটা। গায়ে জামাও নেই বুঝি কোনো?'

'বস্তির ঝি না সাজলে কি দাঁড়ানো যায় কনট্রোলের লাইনে?' দিগ্‌বিজয়িনীর মতো চালের পুঁটলি নিয়ে সুধা বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

মাকে ফিরে পেয়ে ছেলেমেয়েগুলির উত্তালতা তখনো থামে নি, গলির

মুখে ভবতোষ দেখতে পেল একটি পুরুষমূর্তি। দ্বিধায় দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে যাচ্ছে, গলিতে ঢুকবে কি ঢুকবে না। শেষ পর্যন্ত ঢুকলো, আর এগিয়ে এলো কি না ভবতোষেরই বাড়ির দিকে।

আধাবয়সী, কিন্তু যেন ঠিক ভদ্রলোকের পর্যায়ে পড়ে না। যদিও গায়ে একটা ছেঁড়া ও কুঁচকোনো চীনে-সিল্কের পাঞ্জাবি। দাড়ি কামায় নি কত দিন। চুলগুলিতে চিরুনির আঁচড় নেই। চাউনিটা কেমন যেন ঘোলাটে, অপরিচ্ছন্ন।

এদিক ওদিক চেয়ে অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে লোকটা জিগ্গেস করলো : "এ বাড়িতে একটি মেয়েছেলে ঢুকেছে এখুনি?'

মুহূর্তে ভবতোষ রুক্ষ হয়ে গেল। বললে, 'হ্যাঁ, কেন?'

কী ভাবে যে বলবে কিছু ঠিক করতে না পেরে আগন্তুক বললে, 'তাকে আমার দরকার।'

'দরকার?' রাগে কঠিন হয়ে উঠলো ভবতোষের গলা : 'তাকে আপনি চেনেন?'

'হ্যাঁ, না, ঠিক চিনি না, তবে—' লোকটা আমতা আমতা করতে লাগলো।

ভবতোষ ফণা-তোলা সাপের মতো বিষিয়ে উঠলো : 'আরো দুটো গলি ছেড়ে দিয়ে শুঁড়িখানার কাছে থামের তলায় আপনার চেনা জিনিস পাবেন। যান সেখানে। এটা বস্তি নয়, গেরস্থ-বাড়ি। যাকে ঝি ভেবে পিছু নিয়েছেন সে ঝি নয়, ভদ্রলোকের স্ত্রী।'

লোকটা যেন তবু এককথায় চলে যেতে প্রস্তুত নয়। দোমনা করছে—ঘুর ঘুর করছে।

কেলেঙ্কারি বাধাবেন না বলছি। ভালোয়-ভালোয় বেরিয়ে যান গলি থেকে, নইলে পাড়ার লোক জড়ো হলে ঘাড়ের উপর মাথাটা আপনার সোজা থাকবে না বলে রাখছি। আমি অভুক্ত আছি বটে, কিন্তু পাড়ার আর সবাই আমার মতো এত নিস্তেজ হবে না বলেই বিশ্বাস। মারবে তো বটেই, পুলিসেও ধরিয়ে দেবে।'

'আমারই ভুল। মাপ করবেন।' লোকটা আবার সস্পৃহ চোখে তাকালো চার পাশে। তারপর চলে গেল।

কারু সঙ্গে একটা কিছু উত্তেজিত বচসা হচ্ছে অমনি আভাস পেয়ে সুধা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো রোয়াকে। বললে, 'সেই লোকটা এসেছিল বুঝি?'

'কে লোকটা?' আপাদমস্তক জ্বলে গেল ভবতোষের।

'সেই চীনে-সিল্কের পাঞ্জাবি-পরা ভদ্রলোক?'

'ভদ্রলোক? এরি মধ্যে গাঢ় পরিচয় হয়ে গেছে দেখছি।'

'কী যে বলো তার ঠিক নেই। তাকে তাড়িয়ে দিয়েছ বুঝি?' সুধা যেন কণ্ঠস্বরে তাকে খুঁজছে।

'না, তাকে আমার খাট ছেড়ে দিতে হবে।' ভবতোষ গলার আওযাজকে কুৎসিত করে তুললো : 'ওটা একটা বদমাস, তোমাকে ভেবেছে বস্তির ঝি!'

'তা যা খুসি ভাবুক, কিন্তু আমিই তো ডেকে এনেছিলাম।'

কাছাকাছি বোমা পড়লেও ভবতোষ এত চমকাতো না। বললে, 'তুমি ডেকে এনেছ? কেন জানতে পারি?'

চারটি ওকে খেতে দেব বলে। ও আমার সামনেই ছিল, পুরুষের লাইনে। আমার নেয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দোকান বন্ধ হয়ে গেল, আর ও আমার চোখের উপর মাটিতে ভেঙে পড়লো টুকরো টুকরো হয়ে। বললে, বাড়িতে বসে আছে সবাই চালের প্রত্যাশা করে, সে গেলে তবে উনুন ধরবে। তবু তো স্ত্রী-পরিবারকে এক বেলা আধপেটা সে খাওয়াচ্ছিল, কিন্তু নিজে সে উপোস করে আছে প্রায় চার দিন। পাছে ওদের ভাগে কম পড়ে তাই মিথ্যে করে বলতো যে বন্ধুর ওখানে তার নেমন্তন্ন। কিন্তু চার দিনের উপোসের পর নেমন্তন্নের কথা নাকি আজ সে কিছুতেই বলতে পারবে না। তাই আমি ওকে বলেছিলাম, চলুন আমার ওখানে, অন্তত ভাত খাবেন আপনি পেট ভরে। প্রথমটা বিশ্বাস করেনি। পরে বিশ্বাস করলেও রাজি হতে পারে নি। স্ত্রী-পুত্রের জন্যে চাল না নিয়ে গিয়ে নিজে ভাত খাবে লুকিয়ে, হযতো যন্ত্রণা হচ্ছিল, কিন্তু জঠরের যন্ত্রণা তার চেয়েও ভযানক! আহা-হা, তাড়িয়ে দিলে তুমি? সুধা গলা বাড়িয়ে তাকালো এদিক ওদিক।

আস্তে আস্তে একটা তীব্র, ঘন, উগ্র গন্ধ ভবতোষকে আচ্ছন্ন করতে লাগলো। যেন তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে এখুনি। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে।

না, ও কিছু নয়। ও শুধু উনুনের ধোঁয়া।

কল্কি

শ্রীনরেন্দ্রভূষণ ঘোষ

অবশেষে মেঘান্ধকার রাত্রি শেষ হইল।

ফুটপাথের উপর—যেখানটায় একটু আচ্ছাদন আছে, সেইখানে তাহারা শুইয়া রাত্রিশেষেরই কামনা করিতেছিল। হয়তো নূতন দিনের আলোতে খাদ্য আসিবে, জীবন বাঁচিবে। হয়তো।

তাহারা শুইয়াছিল। সারি সারি, অসংখ্য-নগ্নগাত্র, অর্ধ-উলঙ্গ নর ও নারী, শিশু ও বৃদ্ধ—রক্তহীন শুষ্কচর্মে আবৃত জীবন্ত কঙ্কালের সারি। তাহারা শুইয়াছিল। নিদ্রার জন্য নয়, দুর্বলতার জন্য। ক্ষুধা।

আকাশ ঘোলাটে। বৃষ্টি পড়িতেছে ঝিরঝির করিয়া। মেঘাবৃত সূর্যের অস্পষ্ট আলো শহরের বুকের উপর ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়ে।

তারা সর্বশেষে শুইয়াছিল। বুকের উপর দেড় বছরের ছেলেটা ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া স্তন্যপান করিতেছে। ডান দিকে ছয় বছরের ছেলে ভোলা, বাম দিকে দশ বছরের মেয়ে দুর্গা।

মা!—ভোলা উঠিয়া বসিল।

ক্ষীণকণ্ঠে তারা প্রশ্ন করিল, কি রে?

ক্ষিদে পেয়েছে।

তারা চুপ করিয়া রহিল।

মা, ও মা শুনিস না ক্যানে? বলছি না, ক্ষিদে পেয়েছে—

দশ বছরের মেয়ে হইলে কি হয়, দুর্গার বুদ্ধি আছে। সে মায়ের নীরবতার কারণ অনুমানে বুঝিতে পারিয়া বলিল, ক্ষিদে পেলেই বা কি রে হতভাগা—বেলা বাড়ুক, ভিক্ষে ক'রে পেলে তবে খেতে পাবি।

না, আমায় খেতে দে মা, শুনছিস না ক্যানে?

চুপ কর।—দুর্গা ধমক দিল।

তুই চুপ কর্, হারামজাদী।—ভোলা পাল্টা ধমক দিল।

তারা চুপ করিয়াই রহিল। ছেলেমেয়েদের দোষ কি? নিজের জঠরের অভ্যন্তরে যে জ্বালা, যে শূন্যতা পাক খাইয়া খাইয়া নিরন্তর দেহকে দগ্ধ করিতেছে, দুর্বল করিতেছে, তাহা যে কি যন্ত্রণাদায়ক তাহা

তারা জানে, আর জানে বলিয়াই চুপ করিয়া থাকা ছাড়া অন্য কোনও উপায় তাহার নাই।

তারা ভোলার দিকে চাহিল। শীর্ণ ভোলা। পেটটা প্লীহায় স্ফীত, বুকের পাঁজরাগুলি বিকটভাবে প্রকট, চোয়ালের হাড় দুইটি উঁচু, লিকলিকে হাত-পা, ময়লা জমিয়া দেহের ময়লা রঙ আরও ময়লা হইয়া উঠিয়াছে, আর পীড়াদায়ক বুভুক্ষার নিষ্ঠুর হুতাশন তাহার দুই চোখের তারায় জ্বলজ্বল করিতেছে। দুর্গার চেহারাও তেমনই।

বুকের উপরে শায়িত ছেলেটার দিকেও তারা চাহিল। শীর্ণ, অতি শীর্ণ ও নগ্ন ছেলেটা। মায়ের শুষ্ক কঙ্কালসার দেহের অবশিষ্ট শোণিত-ধারা তাহার দুগ্ধহীন বক্ষ হইতে শোষণ করায় সে ব্যস্ত। কিন্তু সুবিপুল প্রয়াসে তাহার কোমল, লালাসিক্ত জিহ্বার দ্বারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও সে একবিন্দু ক্ষীরধারা পায় না। ছেলেটা কাঁদিয়া উঠিল। ক্ষীণকণ্ঠে।

[পাঠক, এবার ওঠ। বেলা আটটা হয়েছে, এবার নরম বিছানা ছেড়ে ওঠা যেতে পারে, নয় কি?

[উঠে বস। পাশের ঘরে একটি সুডৌল হাতের চুড়ির টুংটাং শব্দ হচ্ছে, সেই সুমধুর শব্দকারিণীকে তো তুমি চেন। তিনি চা তৈরি করছেন।

[তোমার শিয়রে টেবিলের ওপর তোমার চাকর আজকের 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' খানা রেখে গেছে (কাগজ পড়তে হয় তো ইংরেজী—সত্যি)। আজ রবিবার। তুলে নাও। বাঃ, অনেকগুলো ছবি বেরিয়েছে তো আজ। ক্ষুধার্ত নর-নারীদের ছবি। সত্যি, ভারী দুঃখের বিষয়! কি যে হচ্ছে আজকাল দেশের! যুদ্ধের জন্য এ অবস্থা, কি করা যেতে পারে? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—আমরা চাকরি করি; সরকারও দয়ালু—র‍্যাশন দেন; তা ছাড়া আমাদের প্রতিপত্তি আছে। অবশ্য একটু বেগ পেতে হয় বইকি। তবু, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

[পাতা ওল্টাও। 'An All-India Disgrace'! ব্যাপার কি? পড়। বাঃ, বেশ লিখেছে তো! এমন লেখা কেবল সায়েবরাই লিখতে পারে। কিন্তু কি ফানি! সায়েবরা না বোঝালে আমরা বুঝি না, না?

[পাঠক, সেই সুডৌল হস্তের অধিকারিণী কক্ষে প্রবেশ করেছেন। শিশির-স্নাত পদ্মের মত মুখে মৃদু হাসির রেশ, রাত্রিজাগর-খিন্ন ডাগর চোখের কোণে বিদ্যুতের জ্বালা। পাঠক, মুগ্ধ হও। বল, এই যে—

সুস্বাগতম্ দেবী। দেবী হেসে বলবেন, ধন্যবাদ দেব। টেবিলের ওপর চায়ের কাপ। বল, এই ছবিগুলো দেখ। তিনি দেখে বলবেন, আহা! বল, সত্যি, বড় দুর্দিন এসে গেছে—চাল ডাল পাওয়া আজকাল যে কি ব্যাপার—উঃ! উত্তরে শুনবে, ঠিক বলেছ, হ্যাঁ, ভাল কথা, মাস শেষ হ'লেই আরও তিন মণ চাল বেশি কিনে রাখ, বুঝলে? মাথা নাড়। আচ্ছা।

[বাইরে ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে। অভ্রের গুঁড়োর মত। একটু একটু বাতাস আছে, অস্পষ্ট আলো। দেহে প্রত্যাখ্যাত তন্দ্রার মদির অনুভূতি, সম্মুখে সুন্দরী নারী, তাঁর চোখে কটাক্ষ, সান্নিধ্যে উষ্ণতা।

[পাঠক, কাগজটা মুড়ে রাখ। চায়ের কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। সুবর্ণের মত পীতাভ চা। পান কর। একটা সিগারেট ধরাও। সিগারেট পুড়ুক—ভোরের আর্দ্র বাতাসে সিগারেটের সুরভিত ধোঁয়া নৃত্যরতা অপ্সরীর সূক্ষ্ম দেহাবরণের মত উড়ে যাক, উড়ে যাক—]

অন্যান্য সকলের কথাবার্তা, কোলাহল তারার কানে ভাসিয়া আসে।

সে কি জল—কি তার গর্জন—উঃ!

চারডি ভাত দ্যাও গো—চারডি বাসী ভাত—

বাড়ি-ঘর সবই ছিল ভাই, সবই ছিল—

কতদিন ভাত খাই নি—কতদিন—

একটুকুন ফ্যানই না হয় দাও গো বাবা, ম'রে গেলাম—

মা খেতে দে।—ভোলা ডাকিল।

তারা নড়ে না, তাহার মাথা ঝিম ঝিম করিতেছে।

জনতা বাড়িয়া চলিয়াছে। মহানগরী। মহানগরীর নাগরিকেরা। তাহারা হাসিতেছে, কথা বলিতেছে। তাহাদের জঠরে অন্ন আছে, দেহে রক্ত আছে, তাহারা বাঁচিয়া আছে। এই অজস্র সুস্থ, জীবিত নাগরিকের আশেপাশে তাহারা পড়িয়া আছে। সেই ক্ষুধার্ত নরনারীরা।

দ্যাও গো বাবু, একমুঠ বাসী ভাত দ্যাও।

দুর্গার বুদ্ধি আছে। সে পথচারীদের প্রতি আবেদন জানায়, চারডি খেতে দ্যাও বাবা, ম'রে গেলাম গো বাবা।

আরে! লোকটা যে ম'রে গেছে!—কে যেন বলিল।

তারা চাহিয়া দেখিল। দূরে বছর পঞ্চাশের একটি কঙ্কাল মরিয়া কাঠ হইয়া রহিয়াছে। তাহার চক্ষু উন্মীলিত, দৃষ্টি স্থির, রক্তাভ : প্রাচীন মমির মত তাহার গাল ভাঙা, চামড়া কুঞ্চিত ও শুষ্ক। খোলা মুখের দুই

পাশে মাছিরা বসিয়া পরমানন্দে লোকটির অবিনশ্বর আত্মার নশ্বর আধারটিকে লেহন করিতেছে।

আমরাও অমনই মরব।—একজন বলিল।

চারডি খেতে দ্যাও গো বাবু, না হয় দুটো পয়সা দ্যাও।—দুর্গার গলা শোনা যায়।

উঃ, আর পারি না।—কে যেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল।

[পাঠক! বায়ুসমুদ্র বেয়ে সে ক্ষীণ দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ আমাদের কানে ভেসে আসতে পারে না। আর কি দরকারই বা তার? তার চেয়ে রেডিওটার সুইচ টিপে দাও। কুমারী সুচরিতা সেন গাইছে। সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় তোমার কক্ষ ঝঙ্কৃত হোক। বাঃ!]

কেবল মধুসূদনই লজ্জাহারী নন। ক্ষুধাও লজ্জাহারী। তাই কমলার লজ্জা নাই। শতচ্ছিন্ন শাড়িটার অন্তরাল হইতে তাহার দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃষ্ট হয়। যৌবনের কঠিন ও কোমল রূপ।

মানুষের চোখ আছে। ভগবান দিয়াছেন। চোখের নিয়ম দেখা। তাই শতসহস্র চোখের অদৃশ্য শায়ক আসিয়া কমলার দেহে বিদ্ধ হয়। কমলার বাঁচিবার আশা আছে।

তারা নিজের পরিধেয়ের প্রতি চাহিল। হাঁটু পর্যন্ত একটি ছিন্ন শাড়ি—অতি মলিন ও দুর্গন্ধযুক্ত। তাহাতে লজ্জা-নিবারণ হয় না।

দুর্গাও ভোলার মত অবুঝ হইয়া উঠিয়াছে, মা, আর যে পারি না—

ভিক্ষে চেয়ে দ্যাখ্ মা।—তারা শুইয়া শুইয়াই বলিল। তাহার দেহ অবশ হইয়া আসিয়াছে। আজ ষষ্ঠ দিন যে সে বাঁচিয়া থাকার উপযুক্ত কিছু খায় নাই। আজ পনরো দিন যাবৎ সে অন্নের মুখ দেখে নাই।

বাবুমশয় গো, দয়া করেন, চারডি খেতে দ্যান বাবু।—ভোলা বলিল। দুর্গা ভোলার কথা শেষ করে, ভগবান আপনাকে রাজা করবে, চারডি ভাত দ্যাও গো বাবু। বাবুরা উত্তর দেয় না।

আকাশে মেঘ পাতলা হইয়া আসিয়াছে। রৌদ্র দেখা দিয়াছে। রাজপথ জনাকীর্ণ। একটি বছর ছয়েকের অতিশীর্ণ ও নগ্ন মেয়ে ফুটপাথের এক কোণে বসিয়া কাঁদিতেছিল। শব্দহীন কান্না। শব্দ করিয়া কাঁদিবার মত তাহার ক্ষমতা নাই। সরু কাঠের ফালির মত লিকলিকে হাত-পা, কেশহীন মস্তকে একটি দগদগে ঘা। হাত নাড়িয়া মাঝে মাঝে পথচারীদের

সে কি যেন বলিবার চেষ্টা করিতেছে। বুঝিয়াও কেহ বোঝে না। এই বিপুল পৃথিবীতে মেয়েটির কেহ নাই। তাহার মা-বাপ তাহাকে ফেলিয়া কোথায় গিয়াছে, কেন গিয়াছে, সে তাহা জানে না। হাত-পা নাড়িয়া মেয়েটি খাইতে চায়।

ক্ষিদেয় ম'রে গেলাম, বাঁচাও গো।—দুর্গা বলিল।

এই যে, ঠিক জায়গায় পৌঁছেছি।—একজন যুবক বলিল।

যুবকটির সঙ্গী কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরা খুলিয়া ছবি তুলিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

তাড়াতাড়ি কর্ রে রমেশ, আবার মেঘলা হ'ল ব'লে।

হ্যাঁ, এই যে।

ক্লিক।

চারিটি ছবি তোলা হইল।

[পাঠক! কালকের 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' বা 'আনন্দবাজার' কিনো। ওই ছবিগুলো তাতে দেখতে পাবে। সেগুলো দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, 'আহা' ব'লে আমরা আমাদের ঔদার্য প্রকাশের সুযোগ পাব, কেমন?

[এই যে তোমার একজন বন্ধু এসেছেন। বসাও। বিশ্ব-রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হোক। কমিউনিজ্‌ম ভাল, না ক্যাপিট্যালিজ্‌ম? রাশিয়ার জয় হ'লে কি হবে? ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও একটু আলোচনা হ'তে পারে। খাদ্য-সমস্যার বিষয়টাও গুরুতর বটে। আলোচনা জ'মে উঠুক।]

পটল আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। মুহূর্তে তাহার মস্তিষ্কের ভিতরটা অন্তর্দাহী অগ্নির সূচীমুখী জ্বালার তাড়নায় আলোড়িত হইয়া উঠিল। আর পারা যায় না। সে উঠিয়া বসিল।

পূর্বদিক হইতে একটি মোটর আসিতেছে। সে এক পাশে দাঁড়াইল।

মোটরটি যেমনই নিকটস্থ হইল, অমনই সে লাফাইয়া পড়িল তাহার সামনে। ড্রাইভার বড় কৌশলী। মুহূর্তে সে ব্রেক কষিয়া সজোরে গাড়ি ডান দিকে ঘুরাইয়া দিল। পটল ছিটকাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

রক্ত। হৈ-চৈ। ভিড়। পুলিস।

মাথায় জল ঢালাতে রক্ত থামিল। পটল জ্ঞান ফিরিয়া পাইল। মোটরের বাবুরা তাহাকে মোটরে চড়াইয়া হাসপাতালে লইয়া চলিল।

পটল মরিল না।

ক্রোধে, দুঃখে সে নিজের মনে বলিল, যদি একবার ভগবানকে পেতাম। কিন্তু ভগবান রসিক লোক। তাঁহাকে পাওয়ার রাস্তা তিনি অনেক ভাবিয়া বন্ধ রাখিয়াছেন।

তারা সব দেখিল। কোলের মৃক শিশুটিকে সে বুকে চাপিয়া ধরিল। তাহার বুকের ভিতর দুর্বল হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ সজোরে উত্তেজিতভাবে চলিতেছে।

দুর্গা সমানে ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়া চলিয়াছে, দয়া ক'রে চারডি খেতে দ্যাও গো বাবুরা, চারডি দ্যাও—

ভোলা কাঁদিয়া বলিল, কিছু পাচ্ছি না যে মা, অ্যাই মা!

পাবি বাবা, পাবি।—তারা উত্তর দিল।

ছাই পাব, কলা পাব, দে আমায় খেতে দে।

চুপ কর্ বাবা।

না. চুপ করব না।—সে সহসা দাঁড়াইয়া নিজের পেটের উপব দুই হাত দিয়া চাপড়াইতে চাপড়াইতে কাঁদিয়া বলিল, না, খেতে দে, আমায় খেতে দে রাক্কুসী, শিগ্‌গির খেতে দে।

তারা হাউহাউ করিযা কাঁদিয়া উঠিল। সে কথা খুঁজিয়া পায় না।

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক থমকিয়া দাঁড়াইল, পকেট হইতে একটি আনি .বাহির করিয়া ভোলার দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, এই নে বাবা।

ভোলা চিলের মত ছোঁ মারিয়া সেই আনিটা উঠাইয়া লইয়া ক্ষণকাল কি যেন ভাবিল। পরক্ষণেই সে দৌড় দিল, যত জোরে পারে।

দুর্গা চীৎকার করিযা উঠিল. থাম্, ওরে ভোলা, থাম্ ভাই।

ভোলা ততক্ষণে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

দুর্গা কাঁদিয়া উঠিল, রাক্কস, রাক্কুসীর পেটের রাক্কস।

চুপ কর্ বাছা, তোকেও দেবে 'খন।

ছাই দেবে, কচু দেবে, ও সব খেয়ে ফেলবে। ও রাক্কস মরবে. নিশ্চয় মরবে।

দুর্গা!—তারা ধমক দিল।

দুর্গার দুই ভাঙা গাল বাহিয়া অশ্রু নামিল, মুখ ফিরাইয়া সে আবার বলিতে লাগিল,, দয়া কর, বাবু গো, চারডি ভাত দ্যাও, চারডি খেতে দ্যাও—

বেলা বাড়িতেছে। আকাশ আবার মেঘলা। বৃষ্টি আবার পডিতেছে। রাস্তায় জনতা, শব্দ, কোলাহল, হাসি। দূরে কন্ট্রোলের দোকানের সামনে

সারি বাঁধিয়া অগণন নর-নারী দাঁড়াইয়া আছে। বেলা বারোটায় দোকান খুলিবে। সেই পঞ্চাশ বছরের লোকটির শবদেহ তেমনই পড়িয়া আছে। মাছিগুলি তাহার মুখের লালা লেহন করিয়া এবার তাহার চোখের তারার উপর বসিয়াছে।

[পাঠক! আজ রবিবার, আজ একটু ভাল খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করেছ তো? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমাদের প্রতিপত্তি আছে। তোমার সেই ডেপুটি বন্ধুটিকে চাল আর তেলের ব্যবস্থাটা ক'রে দেবার জন্যে কাল একবার বলো। আর যদি প্রমথ দারোগার সঙ্গেও দেখা করতে পার তো ভাল হয়। সত্যি, ঈশ্বর আছেন বলেই আমরা খেয়ে বেঁচে আছি। তা না হলে কি হত? আমি কল্পনা করে অনেকবার ভয় পেয়েছি। যদি রাস্তার ওই সব গরিবগুলোর মত তোমার অবস্থা হত তা হলে? তোমার ওই মসৃণ চামড়া শুকিয়ে কুঁকড়ে যেত, গালটা মাংসহীন হয়ে যেত, চোখ দুটো বড় বড় হত, ভেতরের হাড়গুলো মাথা ঠেলে আত্ম-প্রকাশ করত, তিলে তিলে ধীরে ধীরে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে তুমি প্রতি মুহূর্তে এগোতে। ভয় হচ্ছে বুঝি? তবে থাক। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমার আমার সে অবস্থা নয়। ঈশ্বর পরম দয়ালু।

[বাঃ, বাইরে কি ঘনঘটা! মেঘের ছায়ায় চারদিক আবরিত, আকাশের বাঁধন ভেঙে সঙ্গীতের সৃষ্টি করে বর্ষার জলধারা পড়ছে, অবিরাম পড়ছে, মনটা কোথায় যেন উধাও হয়ে যেতে চায়, না?

[রান্নাঘর থেকে মাংসের গন্ধটা ভেসে আসছে বোধ হয়?

[পাঠক! তোমার দেবী এসেছেন।

[বল, নমিতা, বস।

[কেন?

[একটা গান গাও।

[দূর, আমার রান্না শেষ হয় নি।

[সে বামুন দেখবে 'খন, ব'স, একটা গান গাও।

[কি গাইব?

['এমন দিনে তারে বলা যায়।'

[গান হোক।

সমাজ সংসার মিছে সব

মিছে এ জীবনের কলরব

কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব।

[পাঠক! গভীর অনুরাগভরে সুকণ্ঠী গায়িকার একটি উষ্ণ ও সুকোমল হাত নিজের হাতে টেনে নাও। সমাজ, সংসার সব মিছে, বাইরের অন্ধকারে তা মিশে যাক, মিলিয়ে যাক।

দয়া করিবার মত কেহ নাই। দুর্গা'র গলা ধরিয়া আসিয়াছে, সে মাকে বলিল, আর পারছি না, কেউ তো কিছু দেয় না মা।

তারা ভাবিতে চেষ্টা করে যে, আর কি নূতন কথা বলিয়া সে মেয়েকে সান্ত্বনা দিবে। এমন সময় ভোলা ফিরিয়া আসিল। দুর্গা তাহাকে দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, দে ভাই চারডি, কি এনেছিস।

ভোলার চোখের তারায় প্রাণের অতি ম্লান জ্যোতি, সে বলিল, কিছু আনি নি তো।

দুর্গা বিশ্বাস করিল না, যাঃ, দে না ভাই, লক্ষ্মীটি।

চার পয়সার কটা ফুলুরি মিলবে রে হারামজাদী?

আনিস নি কিছু?

না।

দুর্গা ক্রোধে ফাটিয়া পড়িল, পাজী, গাধা, রাক্কস, সব খেয়ে ফেলেছিস? মা, ও মা, শুনছিস? আমার জন্যে কিছু আনে নি। হারামজাদা।

গাল দিস না দিদি।

ইস! দেব না, একশো বার দেব, মুখপোড়া, শুয়োরের বাচ্চা।—বলিয়াই দুর্গা দুম করিয়া ভোলার পিঠে এক কিল বসাইয়া দিল। পরমুহূর্তেই ভোলা হিংস্র জন্তুর মত বোনের চুলের মুঠি ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তোকে খুন করে ফেলব রাক্কুসী।

মা, মেরে ফেললে আমায়, ও মা!

তারা কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া ছেলেমেয়েদের ছাড়াইয়া দিতে গেল। কিন্তু কেহ ছাড়ে না। অতিকষ্টে তাহাদের থামাইয়া সে বলিল, তোদের পায়ে পড়ি, থাম, থাম।

বাঃ রে, আমায় কিছু দিলে না, আর আমি ছেড়ে দেব? আমি যে ম'রে যাচ্ছি, সেটা দেখিস না?

তারা কাঁদিয়া ফেলিল, দেখছি বইকি, কি করবি মা, ভগমানকে ডাক্।

ভগবান? দুর্গা ভগবানের নাম শুনিয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে ডাকার কোনও সার্থকতা আছে কি না, তাহা তো সে আজও উপলব্ধি করে নাই।

দুর্গা রাস্তার দিকে আবার মুখ ফিরাইয়া বসিল, তাহার চোখে অশ্রুর ধারা। অনুনাসিক সুরে সে বলিতে লাগিল, ম'রে গেলাম গো, চারডি খেতে দ্যাও, একমুঠো ভাত দ্যাও গো বাবুরা।

শুধু দুর্গা নহে, সেখানে তাহাদের মত আর যাহারা ছিল, তাহারাও দুর্গার মত কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভিক্ষা করিতেছিল।

অজস্র লোকের মিছিল চলিয়াছে। ট্রাম, বাস, রিক্‌শা, মোটর। বড় বড় অট্টালিকা আর ঐশ্বর্য। উপরে দুইটি বোমারু বিমান বায়ুতরঙ্গে বড় বড় ঢেউ তুলিয়া সশব্দে চলিয়া গেল।

ঝিরঝির, ঝিরঝির, বৃষ্টি পড়িতেছে। আকাশ খানিকটা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু পূবের আকাশে আবার ঘনকৃষ্ণ মেঘের পুঞ্জ পাহাড়ের মত মাথা ঠেলিয়া উঠিতেছে। দূরে কন্ট্রোলের দোকানের সামনে নর-নারীর সারি দীর্ঘতর হইয়া উঠিয়াছে। বৃষ্টিতে, কাদায় তাহারা ভিজিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তবুও কেহ নড়ে না। তাহাদের কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছে।

শুনছ তোমরা?—ছাতা মাথায় একজন বাঙালী ও একজন মাড়োয়ারী আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল।

বাঙালীটি বলিল, তোমরা সকলে আগারওয়ালা বাবুর মোড়ের ওই বড় বাড়িতে চল, ওখানে খেতে দেবে।

দমকা বাতাসে যেন শুষ্ক মৃত পত্ররাশি মর্মরধ্বনি তুলিল।

মাড়োয়ারীটি ডাকিল, দের করো না, এস শিগগিরি করে।

ছেলেমেয়েদের ডাক দিয়া দ্রুতকণ্ঠে তারা বলিল, শিগগির চল্, শিগগির চল্ রে।

চল মা।—ভোলা লাফাইয়া উঠিল।

তাড়াতাড়ি চল মা।—দুর্গাও প্রতিধ্বনি তুলিল।

তারা উঠিয়া দাঁড়াইল। পা দুইটি একবার থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, চোখের সম্মুখে একবার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। প্রাণপণে সে নিজেকে সামলাইয়া লইল।

সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকে দ্রুতপদে চলিতেও আরম্ভ

করিয়াছে। আসন্ন খাদ্যের আশায় তাহারা হঠাৎ জোরে জোরে কথা বলিতেছে, জোরে জোরে পা ফেলিতেছে। তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি।

কেবল পড়িয়া রহিল সেই পঞ্চাশ বছরের লোকটার শীতল দেহ।

আরও দুইটি প্রাণী পড়িয়া রহিল। একজন বৃদ্ধা। চটের মত মোটা একটা নোংরা কাপড় কোমরে জড়াইয়া রহিয়াছে। তাহারই সম্মুখে একটি বছর পঁয়ত্রিশের লোক ফুটপাথের এক পাশে হাত পা ছড়াইয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে। মাঝে মাঝে লোকটি চক্ষু মেলিতেছিল আব মুখ-ব্যাদান করিয়া জোরে জোরে নিশ্বাস লইতেছিল।

যাহারা খাদ্যের লোভে ছুটিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজন লোক পিছন ফিরিয়া ডাকিল, এই বুড়ী, তোরা যাবি নি?

বুড়ী মাথা নাড়িল।

ক্যানে?

বুড়ী শায়িত লোকটিকে অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইল।

কি হয়েছে।

মরছে।

লোকটি ক্ষণকাল চুপ থাকিয়া প্রশ্ন করিল, উটি তোর কে?

বুড়ী হাসিয়া বলিল, আমার ছেলে. দশ মাস ওকে আমি পেটে ধরেছিলাম।

লোকটি দ্রুতপদে সরিয়া গেল।

[পাঠিকা! মেঘমেদুর মধ্যাহ্নের অপরূপ সৌন্দর্য কি তুমি দেখবে না? বাতায়ন খুলে দাও। অভ্রের গুঁড়োর মত বৃষ্টি পড়ছে, ঝিরঝির ঝিরঝির। বাঃ! অলস দেহ এলিয়ে দাও শুভ্র শয্যার ওপর। বাতায়ন-পথ দিয়ে দূরে চাও। তোমার সুন্দর মুখের ওপর বায়ু-তাড়িত অলকগুচ্ছ বারংবার এসে পড়ুক, কালো চোখে স্বপ্ন ঘনাক।

[নিজের সংসারের কথা একবার ভাব। সব আছে। তুমি সুখী। পাশে তোমার চার বছরের মোমের পুতুল, তোমার স্বামীর বুকের মানিক, তোমার ছেলে। তার দিকে একবার সস্নেহে তাকাও। একদিন ও বড় হবে, বিলেত যাবে, আই-সি-এস হবে, না? নিশ্চয়ই।

[পাঠিকা! আজ বিকেলে তোমায় রিহার্সালে যেতে হবে। দেশের দুঃস্থ নর-নারীদের সাহায্যের জন্য চ্যারিটি হবে, না? তোমার কৃতিত্ব যে এতে অনেক, তা আমি জানি। তুমিই মেয়েদের গান শেখাবে, নাচ শেখাবে।

পাঠিকা, তুমি যে দেশের নর-নারীর দুঃখ সহ্য করতে পার না, তা আমি জানি। তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

[আঃ! ধোঁয়ার মত পাতলা মেঘ আকাশে উড়ে যাচ্ছে—উড়ে যাচ্ছে।]

বৃষ্টিতে ভিজিয়া, অতি কষ্টে ছেলেমেয়েদের লইয়া তারা পেঁাছাইল। তাহার শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছে। আর শক্তি নাই।

সামনের দিকে চাহিয়া তারা হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। ক্ষুৎকাতর জনসমুদ্রের উন্মত্ততা। ঠেলাঠেলি, মারামারি, আর্তনাদ, গালিগালাজ। সবাই আগে প্রবেশ করিতে চাহিতেছে। যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল, তাহারা পশ্চাতে বসিয়া আছে। তারাও ছেলেমেয়েদের লইয়া বসিল।

দুর্গা কাঁদিয়া বলিল, চল্ না মা, এগিয়ে চল্ না।

ভোলা হাত ধরিয়া টানিল, চল্ না এক পাশ দিয়ে মা।

তারা মাথা নাড়িল, মরে যাব মা, তার চেয়ে এমনই থাক, না হয় একটু দেরিতে পাব।

দুর্গা কাঁদিয়া বলিল, সব যে ফুরিয়ে যাবে মা, শিগগির চল্।

তারা আর মাথা খাড়া রাখিতে পারে না, সে শুইয়া পড়িয়া বলিল, পাগলী কোথাকার, ডেকে নিয়ে এল যে!

বৃষ্টিতে তাহাদের সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে।

দুই ঘণ্টা পরে। মাড়োয়ারীর বাড়ির ফটক বন্ধ হইল। অনেক অভুক্ত নর-নারী তখনও অবশিষ্ট। এত ভিড় প্রত্যাশা করা যায় নাই।

অভুক্তেরা আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

পূর্বোক্ত বাঙালী বাবুটি ফটকের ওপাশ হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, আজ সব ফুরিয়ে গেছে, তোমরা কাল এসো।

অভুক্তদের কোলাহল বাড়িয়া গেল। কিন্তু ফটকটা আর খুলিল না। লোহার ফটক, ভাঙাও যায় না।

কাল? তারা বিশীর্ণ হাসি হাসিল। কাল? সে তো অনেক দেরি, অ-নে-ক দূর।

দুর্গা মায়ের হাত ধরিয়া টান দিল, ও মা, ফুরিয়ে গেল যে!

তারা উত্তর দিল না।

দুর্গা ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, তখনই তো তোকে বললাম, তুই শুনলি না। তুই রাক্ষসী, না খাইয়ে তুই আমায় মেরে ফেলতে চাস।

ভোলাও কাঁদিতেছে, মা, খেতে দে, খেতে দে।

দুর্গা গর্জন করিয়া উঠিল, মর্, মর্, মুখপোড়া, চার পয়সার ফুলুরি খেয়েও তোর পেট ভরে নি?

ভোলা রুখিয়া উঠিল, গাল দিস না, খবরদার, পেত্নী কোথাকার।

পরক্ষণেই ভাইবোনে মারামারি আরম্ভ হইয়া গেল। কোলের ছেলেটাও কাঁদিতেছে। ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ ক্রন্দন। তারা উঠিয়া দাঁড়াইল। দেহ তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

আয়, মারামারি করিস না, লক্ষ্মীরা, আয়, দেখি কি পাই।

ছেলেমেয়েদের ছাড়াইতে তাহার দম বন্ধ হইয়া আসে।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাচাইয়া দুর্গা ভেঙচাইল, কচু, কচু, কচু পাবে।

রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে দুর্গা ভিক্ষা চায়, এক মুঠো ভাত দ্যাও গো, ম'রে গেলাম।

দুটো পয়সা দ্যাও বাবু, দয়া কর।—ভোলাও বলে।

তারা একটি গলিতে প্রবেশ করিল। দূরে একটি ডাস্টবিন দেখা গেল। দুর্গা ও ভোলা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিল। সেই দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জনার স্তূপ সরাইয়া সরাইয়া তারা একটি ছাইমাটি-লাগানো শুষ্ক রুটি ও ভোজনশেষে পরিত্যক্ত একটি শালপাতা পাইল। শালপাতায় কয়েকটি ভাত লাগিয়া আছে। দুর্গা মায়ের হাত হইতে রুটিটি কাড়িয়া লইল। ভোলা সেই শালপাতা পরম আগ্রহে লেহন করিতে লাগিল।

দূরে একটি হৃষ্টপুষ্ট দেশী কুকুর শুইয়া আছে। সে নির্লিপ্তভাবে তাহাদের দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। ওই খাদ্যে তাহার লোভ নাই।

ছিন্ন শাড়ির প্রান্ত দিয়া রুটিটি মুছিয়া দুর্গা তাহা ছিঁড়িয়া নিজে একটু বেশি লইয়া ভোলাকে কমটুকু দিল।

ভোলার কণ্ঠে অনুযোগ ধ্বনিত হইল, আমায় এত কম দিলি যে?

দুর্গা ফোঁস করিয়া উঠিল, এই যে দিয়েছি এই তোর বাপের ভাগ্যি, তুই আমায় ফুলুরি দিয়েছিলি রে রাক্কস?

মা, ভাল হবে না কিন্তু।

থাম্, ওরে থাম্, এবার ফিরে চ বড় রাস্তায়, ইদিকে কিছু পাব না।

তারার দেহে আর শক্তি নাই।

দুর্গা আর ভোলা সেই রুটির টুকরা চিবাইতেছে। বন্য পশু-শাবকের

মত ধারালো তাহাদের দাঁত, ক্ষুধায় তাহার ধার আরও বাড়িয়াছে। হউক না রুটি শুষ্ক কঠিন, তাহারা খাইবেই।

গলির শেষের বাড়িটার দোরগড়ায় গিয়া দুর্গা ডাকিল, কে আছ গো, দয়া কর, ম'রে গেলাম গো মা।

একটি বৃদ্ধা দরজার সামনে দাঁড়াইয়া ছিল, সে তাহাদের দেখিয়া বোধ হয় বিচলিত হইল। সে ডাকিল, দিদি, ও নীলুদি!

একটি তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

কি ঠাকমা?

কিছু যদি থাকে তো এনে দে তো।

বাঃ রে, তুমি ঠাকমা সব্বাইকে দয়া করতে আরম্ভ করলে আমরা কিন্তু মারা পড়ব, বাড়িতে কিচ্ছু নেই।

দেখ্ দিদি, লক্ষ্মীটি।

মেয়েটি ভিতরে গেল। খানিক পরে একটি বাটিতে কয়েকমুষ্টি ডালভাত সে লইয়া আসিল। দুর্গা তাহাদের বাটিটা আগাইয়া দিল। বাটিতে পড়িতেই ভোলা আর দুর্গা তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে করিতে পথে নামিল।

ঠাকমা, ভেতরে এস।

চল্ বাছা।

দরজা বন্ধ হইল।

খাদ্য লইয়া দুই ভাইবোনে আবার মারামারি আরম্ভ করিয়াছে। তারা তাহাদের মধ্যে গিয়া জোর করিয়া আধমুঠি কাড়িয়া লইয়া বুকের ছেলেটার মুখে দিল। ছেলেটা তাহা গিলিল। ছেলেটাকে খাওয়াইতে আর ভোলা ও দুর্গার খাওয়া দেখিতে দেখিতে তারার রসনায় জল আসিল। ভাত! আঃ! সে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, দুগগা, মা, ক্যামন নাগছে রে? দুর্গার কানে সে কথা গেল না।

ওরে, শুনছিস তোরা, আমায় চারডি দিবি?—তারার চোখ ঝাপসা হইয়া আসিল।

মায়ের ভিক্ষা কেহ শুনিল না।

[পাঠক! আজ সন্ধ্যায় মেট্রোতে ভাল ছবি আছে। তা ছাড়া দু-একজনের সঙ্গে দেখাও তোমাদের করতে হবে। গৃহিণীকে রূপসজ্জা করতে বল।

[পাঠিকা! এবার বৃষ্টি থেমেছে, আকাশ পরিষ্কার হতে চলেছে, সময় হয়েছে। এবার ওঠ। চ্যারিটি শো'র রিহার্সাল। ড্রাইভারকে ডেকে মোটর বার করতে বল। তারপরে দর্পণের সামনে যাও। দর্পণে তোমার সুঠাম দেহের প্রতিচ্ছবি। তোমার দর্পণ তোমার অন্ধ স্তাবক নয়। সে বলছে, তুমি বড় সুন্দর। শুনছ? তোমার দীর্ঘ কেশকে আঁচড়ে ঠিক ক'রে তোমার কুন্দশুভ্র মুখমণ্ডলে, তোমার রক্তিম গালে বিলিতী পাউডার আর ক্রীম লাগাও। তোমার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটে উঠুক। ভয় নেই, তোমার ও-রক্তিম গাল অনাহারে বসে যাবে না, তোমার চোয়ালের হাড় দুটো অনশনক্লিষ্ট দেহের দৈন্য জানাতে মাথা ঠেলে উঠবে না। তোমার সৌন্দর্য অম্লান। তোমার ভয় নেই। ভয় তাদের, যারা দারিদ্র্য-পাপে পাপী।

[পাঠিকা! যদি আমার কথায় নির্লজ্জতা প্রকাশ পায়, যদি তোমার মনে হয় যে, আমি অভদ্র, আমায় ক্ষমা করো।]

আবার সেই ফুটপাথ।

তারা শুইয়া পড়িয়াছে। তাহার সারা দেহ অবশ হইয়া আসিয়াছে।

ফুটপাথ জলে কাদায় একাকার, তাহাদের পরিধেয় সিক্ত। কোলের ছেলেটা কাঁদিয়া উঠিল। তারা নিঃশব্দে ছেলেটার মুখে একটি বিশুষ্ক স্তন গুঁজিয়া দিল। ছেলেটা গভীর আগ্রহে তাহা চুষিতে লাগিল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই কোনও ফল না পাইয়া সে আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

অতি ক্ষীণকণ্ঠে তারা ডাকিল, দুগগা!

কি মা?

বাটিতে ক'রে একটু জল নিয়ে এসে এটাকে খাওয়া।

আচ্ছা মা।

ভোলা ভিক্ষা চাহিতেছে, দুটো খেতে দ্যাও গো বাবুরা, রাজাবাবুরা, আর যে পারছি না।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। রাস্তায় ভিড়। সুবেশ নর-নারী, যুবক-যুবতী। ট্রামে বাসে অজস্র যাত্রী। হাসি। কোলাহল।

দূরে সিনেমার বাহিরে বড় ভিড়। আজ একটি নূতন ছবি দেখানো হইবে।

বাতাসে বিলাসীদের দেহসৌরভ আর সিগারেটের ধোঁয়া।

তারা ভাবে। ক্ষুধায় অবসন্ন, নির্জীব চেতনার সমুদ্র হইতে অতীতের

ভাঙা জাহাজটা ভাসিয়া উঠিতেছে। ছবির মত গ্রামের বুকে একটি কুটীর ছিল, জোয়ান স্বামী ছিল, ক্ষেতে ধান ছিল—ছিল, ছিল, সবই ছিল।

[পাঠিকা! সবাই এসেছে তো? মিস দাস, মঞ্জু, অমিতা, চিত্রা, সুজাতা, মিঃ সরকার, মিঃ সেন, ললিত, অশোক, ফাল্গুনী এবং আর সকলে? হ্যাঁ, তারা এসেছে। তারা আলোচনা করছে। যুদ্ধের অতি-আধুনিক অবস্থা কি? বাংলা দেশের এই দুর্দশার জন্য দায়ী কে? (মিঃ সেন, পি-এইচ-ডি, নয়?) চ্যারিটিতে কত টাকা উঠতে পারে? লাইট আর ড্রেসের জন্যে অর্ডার দেওয়া হয়েছে তো? ফার্স্ট এম্পায়ারে, না গ্লোবে? কোথায় হবে?

[পাঠিকা! তুমি আলোচনার অবসান করাও। যন্ত্রশিল্পীরা বৃত্তাকারে বসুক। মৃদঙ্গের বোলের সঙ্গে সেতার ও সরোদ ঝঙ্কার তুলুক। অমিতাকে ডেকে তুমি সামনে দাঁড় করাও। তুমি তাকে শেখাও—উর্বশী-নৃত্য। দক্ষিণ পদ শ্লথভাবে বাম পদের পার্শ্বে রাখ, দক্ষিণ হস্তে পতাকা-মুদ্রায় নৃত্যের সূচনা হোক। গ্রীবা বাম পার্শ্বে নত ক'রে বাম হস্তের আলপদ্ম-মুদ্রায় তুমি তোমার অনন্ত যৌবনের ইঙ্গিত দাও,—তোমার আকর্ণ-বিশ্রান্ত নিমীলিত নেত্রের কোণে দেবজয়ী কটাক্ষের জ্বালা বহ্নিমান হয়ে উঠুক। উর্বশীর নূপুর-নিক্বণে বিমুগ্ধ সুরসভা ঝঙ্কৃত হোক। নৃত্য হোক তবে।]

সেই লোকটি মরিয়াছে। তাহার বৃদ্ধা মাতা তাহার শিয়রে নিঃশব্দে শুইয়া আছে। কমলার বাপ প্রশ্ন করিল, তোমার ছেলে এখন ক্যামন?

বুড়ী তাহার দিকে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল, ম'রে গেছে।

তারা স্তিমিত ঝাপসা দৃষ্টি মেলিয়া দেখিতেছিল যে, রাস্তার ওপারের ফুটপাথে একটি লোক রাঁধিতেছে।

ভোলা ভিক্ষা চাহিতেছে, দুটো পয়সা দ্যাও গো বাবু, দুটো পয়সাই দ্যাও।

সন্ধ্যা হইয়াছে। ভীতা মহানগরীর আলো জ্বালিবে না।

[পাঠিকা! তোমার নৃত্য অপূর্ব! আলোলিত মস্তকে প্রকম্পিত গ্রীবাদেশকে পরিবাহিত কর। উভয় হস্তের শিখর ও চন্দ্রকলা মুদ্রাকে মৃগশীর্ষে রূপান্তরিত ক'রে বিপরীত বাহুর উপর প্রতি হস্ত স্থাপন কর। তোমার কালো চোখের আগুন মহেন্দ্রের বজ্রকেও তুচ্ছ করে। উর্বশী, তোমাকে জয় করার মত অস্ত্র কন্দর্পের তূণীরেও নেই।

[মৃদঙ্গ ধ্বনিত হোক, তোমার নৃত্যরত দেহের গতিতে বায়ু স্তব্ধগতি।

পাঠিকা! তোমার নৃত্য অপূর্ব!]

নিঃশব্দপদচারী শ্বাপদের মত রাত্রি আসিল।

রাত্রি গভীর হয়। কোলাহল ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসে।

আবার বৃষ্টি পড়িতেছে। যানবাহনের চলাচল কমিয়াছে। কাহারা যেন ফিসফিস করিয়া কথা বলিতেছে! অন্ধকারে, পথের মাঝখানে আসিয়া মেয়েরা দাঁড়াইয়াছে। অন্ধকারে চিনিবে না, সুতরাং লজ্জা নাই। তাহারা অপেক্ষা করে। প্রতিটি পথচারীকে তাহারা ডাকে। যদি একমুষ্টি অন্নলাভ হয়, কে জানে!

অন্ধকারে ফুটপাথ হইতে অনেক পুরুষ উঠিয়া দাঁড়ায়। গলি বাহিয়া দিনের আলোতে দেখা বাড়ির দেওয়াল টপকাইয়া তাহারা বাড়ির ভিতর প্রবেশ করে।

মাঝে মাঝে চীৎকার ভাসিয়া আসে, চোর—চোর। পুলিসের হুইস্‌ল।

একটি লোক আসিয়া কমলার কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল।

এই, ভাত খাবি?—লোকটি হাসিল।

দ্যাও, দ্যাও, চারডি দ্যাও গো।—সকলে কলরব করিয়া উঠিল।

দুর্গা মাকে ঠেলা দিল, মা, খেতে দে, ওমা!

ভোলা হঠাৎ বমি করিতে আরম্ভ করিল।

লোকটি ডাকিল, আমার সঙ্গে আয়।

কমলার মা ফিসফিস করিয়া বলিল, যা না হতভাগী।

কমলা বাপের মুখের দিকে চাহিল। বাপ বলিল, যা।

কমলা উঠিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকার। সেই অন্ধকারে ফুটপাথে তাহারা পড়িয়া থাকে। অজস্র নর-নারী। একদল নর-নারী রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল। পরদিন কণ্ট্রোলে অল্প দামে যদি কিছু চাল নুন পাওয়া যায় তাহারই জন্য। কিউ। একদিন ওরাও এই ফুটপাথে আসিয়া শয়ন করিবে।

ভোলা বমি করিতে করিতে কাঁদিতেছিল।

দুর্গা ডাকিল, মা, মা গো, দেখ্ না, ভোলা ক্যামন করছে।

তারা কথা বলিতে পারে না। বক্ষলগ্ন ছোট ছেলেটি তন্দ্রাচ্ছন্ন।

পূবের বাতাস বহিতেছে। শীত বোধ হয়।

ভোলা রাস্তার একপাশে গিয়া মলত্যাগ করিতে বসিল।

কালো আকাশে কালো মেঘ। বৃষ্টি পড়ে।

পুলিসের বুটের শব্দ। খট খট খট খট।

দুর্গা ডাকিল, মা শুনছিস না ক্যানে? দেখ, ভোলা ক্যামন করছে।

ভোলা মায়ের পাশে গড়াইয়া হাঁপায়, কথা বলিতে পারে না।

[পাঠক-পাঠিকা! ঘুমোবার সময় হয়েছে।]

রাত্রি বাড়ে। কমলা ফিরিয়া আসে। তাহার হাতে একটি শালপাতার ঠোঙায় ভাত ও তরকারি।

এনেছিস? ভাত এনেছিস? তাহার বাপ-মা উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

হ্যাঁ।

দে, আমায় দে।

বাঃ রে, গতর খাটিয়ে আনলাম, আমি খাব না?

কমলা বসিয়া গোগ্রাসে ভাত গিলিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার বাপ-মাও সেই ভাতের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, দে দে, চারডি খেতে দে মা।

ভাত! তারার অবশ চেতনায় যেন তড়িৎস্পর্শ হইল। দুর্গা তন্দ্রা-মগ্না। ভোলার জ্ঞান নাই। কলেরার শেষ অবস্থা।

তারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া উঠিয়া, হামাগুড়ি দিয়া কমলার পিছনে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের দিকে একটি হাত প্রসারিত করিয়া সে বলিতে চাহিল, আমায় একমুঠো দ্যাও। কিন্তু পারিল না। কমলার বাপ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ধাক্কা দিয়া বলিল, যা যা, মাগী, এখানে ভাত কোথায় রে?

তারা মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। খানিকক্ষণ পড়িয়া থাকিয়া সে আবার হামাগুড়ি দিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেল। অনেকক্ষণ সে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

ছোট ছেলেটার ঘুম ভাঙিয়াছে। সে কাঁদিয়া উঠিল। চোখে আর তারা দেখিতে পায় না। হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া সে ছেলেটাকে বুকে টানিয়া লইল। মনে পড়ে—গৃহ, স্বামী, সবুজ ধানের ক্ষেত, তারার সংসার। তারা একবার মেয়ের মাথায় হাত রাখিয়া কি যেন বলিতে চাহিল, কিন্তু পারিল না। তাহার জীবনীশক্তি আর নাই। আবার হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া সে ভোলার দেহে হাত রাখিল। ভোলার নিস্পন্দ দেহ বরফের মত ঠাণ্ডা। তারা ছেলেকে ডাকিতে চেষ্টা করিল, পারিল না।

রাত্রি আরও বাড়ে। তারার নিঃশ্বাস টানা বন্ধ হইল। ছোট ছেলেটা কিন্তু পরম যত্নের সহিত শীর্ণদেহী মায়ের শুষ্ক, রসহীন স্তন শোষণ করিতে থাকে।

[পাঠক-পাঠিকা! ঘুম আসছে, না? ঘুমও; শুভরাত্রি। তোমরা ঘুমও।

[আমারও ঘুম আসছে। কিন্তু আমি তো ঘুমতে পারব না। নিদ্রায় জাগরণে সদাসর্বদা আমি আজকাল একটা দুঃস্বপ্ন দেখি। আমার ভয় হয় কল্কির পালা শুরু হতে দেরি নেই। মনে হয় সব ধ্বংস ভ্রংশ হয়ে ছড়িয়ে যাবে চারিদিকে।—ধ্বংস হবে আমারই সম্মুখে, এই মুহূর্তে।

[তোমরা ঘুমও, সমস্ত জাতি ঘুমচ্ছে; কেন ঘুমবে না? কিন্তু আমি তো ঘুমতে পারছি না। মনে হচ্ছে প্রচণ্ড আঘাত হেনে তোমাদেরও ঘুম ভাঙিয়ে দিই।—আমার চোখে ঘুম নেই—তোমাদেরও ঘুম হরণ করি।

[কিন্তু পারছি কৈ? অতএব তোমরা ঘুমও, কোনো ভয় নেই। কিন্তু বল, আমি কি করে ঘুমব?]

শেষের হিসাব

শ্রীপরিমল গোস্বামী

নতুন ফ্ল্যাটে উঠে এসে পূর্বতন বাসিন্দার একখানা হিসাবের খাতা হঠাৎ হাতে এল। দেয়ালের গায়ের আলমারির মধ্যে খাতাখানা পড়ে ছিল। চুনকাম করার সময়েও কেউ এটা লক্ষ্য করেনি, আশ্চর্য! আলমারিটা তারা কেউ খোলেনি বোধ হয়। কিন্তু আগের সেই ভাড়াটিয়াই বা কেমন লোক, হিসাবের খাতাখানাই নিতে ভুলে গেছে!

খাতাখানা সরিয়ে রেখে দিলাম, খোঁজ পড়বে একদিন হয় তো, তখন দেওয়া যাবে।

এদিকে আমার সংসারের যা দুর্গতি, তাতে এই সামান্য পরোপকারের প্রবৃত্তিও এখন আমার কাছে অস্বাভাবিক বোধ হয়। জীবনরক্ষার মূল জিনিসেরই অভাব, অথচ বাঁধা আয়ে সংসার চালাতে হবে। এ অবস্থায় কার কি রইল, কার কি গেল, ভাববার প্রবৃত্তি হয় না। চোখের সামনে সব ভেঙে পড়ছে। ঘুন ধরে গেছে বাংলাদেশের জীবনে।

মাসে যা উপার্জন করি তাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিছুই কেনা হয় না। জানুয়ারি মাসের বেতন দিয়ে শুধু বিছানার চাদর কিনেছি। পরিবারের লোকসংখ্যা দশ, এক সঙ্গে অনেক জিনিস কিনতে হয়। ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন দিয়ে কিনলাম দশ জোড়া জুতো। এমনি ভাবে এক এক মাসে এক এক জাতীয় জিনিস! কোনো মাসে কাপড়, কোনো মাসে চাল, কোনো মাসে তেল-নুন। জুলাই মাসের বৃষ্টিতে পাঁচটি ছাতা কিনতেই এক মাসের বেতন ফুরিয়ে গেল।

গ্রীক পৌরাণিক গল্পে আছে পারসিউস্ গর্গন-হত্যার অভিযানে যাবার পথে এক সময় তিনটি বৃদ্ধা ভগিনীর দেখা পায়। তাদের তিনজনের চোখ ছিল মাত্র একটি, যখন যার দেখার দরকার হত সে তখন ঐ চোখটি আর একজনের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে ব্যবহার করত। তার কথাই আজ মনে পড়ছে। বর্তমানে আমাদের দেশের এক এক পরিবারের পাকস্থলী থেকে শুরু করে ছাতাটি পর্যন্ত যদি ঐ রকম একটিতে কাজ চলত!

একদিন একা বিছানায় পড়ে এই সব নানা অসম্ভব কল্পনায় মেতেছি,

এমন সময় খেয়াল হল আমার এই ফ্ল্যাটের পূর্বপুরুষটি কি ভাবে সংসার চালাতেন দেখা যাক। তাঁর সেই ফেলে-যাওয়া হিসাবের খাতাখানা খুলে শুয়ে শুয়েই পড়তে আরম্ভ করলাম। পাঁচ বছরের হিসাব। পড়তে পড়তে উঠে বসলাম। এক নিঃশ্বাসে সবটা পড়ে ফেলতে হল। শেষ করে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে উত্তেজনা কমে এল, বুঝলাম এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। কিন্তু বুঝেও নিষ্কৃতি পেলাম না।

আমার নিজের হিসাবের খাতাখানাও খুলে দেখি, এই হিসাবের সঙ্গে তার আশ্চর্য মিল! এ'র শেষ হিসাব লেখা হয়ে গেছে, কিন্তু আমার শেষ হিসাব এখনও লেখা হয় নি—ঐখানেই যা তফাৎ।

প্রতি মাসে আশী টাকার সযত্ন হিসাব। ভদ্রলোক মাসে মাত্র আশী টাকা বেতন পেতেন, কিন্তু বেশ বোঝা যায় তিনি কখনও ধার করেননি। তাঁর এই হিসাব থেকে আমি পাঁচ বছরের ছটি মাস বেছে নিয়েছি। এরই মধ্যে পাওয়া যাবে তাঁর ইতিহাস।

কিন্তু কোন্ এক অদৃশ্য শক্তি এই হিসাবের সঙ্গে আমার নিজের হিসাব এক সুরে বেঁধে দিয়েছে, ভাবতে গেলে আমি অস্থির হয়ে উঠি। তাই নিজের মনকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে আমার আবিষ্কার-করা হিসাবের খাতা থেকে আমার বাছাই করা ছ'টি হিসাব সবার সামনে এনে হাজির করলাম, হয় তো আরও পাঁচজনের হিসাবের সঙ্গে এর কিছু সাদৃশ্য থাকতে পারে। এটা কল্পনা করেও অনেক আরাম বোধ করছি। আমার একান্ত অনুরোধ, নিচের দেওয়া পাঁচ বছরের ছ'টি হিসাব আপনারা ভাল করে মিলিয়ে পড়ুন।

(১) ১৯৩৯ জুলাই

বাড়ি ভাড়া	...	...	১৫৲
চাল দু'মণ	...	...	১০৲
কাপড় ৪ জোড়া	...	...	১০৲
বাজার খরচ	...	...	৩০৲
কয়লা ৩ মণ	...	...	১৷৷৹
থিয়েটার ও সিনেমা	...	...	৭৲
অন্যান্য	...	...	৬৷৷৹
			৮০৲

(২) ১৯৪০ জুলাই

বাড়ি ভাড়া	...	...	১৫৲
চাল দু'মণ	...	...	১২৲
কাপড় ৪ জোড়া	...	...	১৮৲
কয়লা ৩ মণ	...	...	২।০
বাজার	...	...	৩০৲
অন্যান্য	...	...	২৷০
			৮০৲

(৩) ১৯৪১ জুলাই

বাড়ি ভাড়া	...	...	১৫৲
চাল এক মণ	...	...	১০৲
বাজার	...	...	৩৫৲
কাপড় ২ জোড়া	...	...	১৪৲
কয়লা ২ মণ	...	...	২৲
অন্যান্য	...	...	৪৲
			৮০৲

(৪) ১৯৪২ জুলাই

বাড়ি ভাড়া (গত জানুয়ারি থেকে সাময়িক ভাবে কম)	...	...	১২৲
চাল আধ মণ	...	...	১২৲
বাজার	...	...	৩৬৲
কয়লা ২ মণ	...	...	৩৲
লটারির টিকিট	...	...	৬৲
কাপড় ১ জোড়া	...	...	১০৲
অন্যান্য	...	...	১৲
			৮০৲

(৫) ১৯৪৩ জুলাই

বাড়ি ভাড়া (পুনরায় বৃদ্ধি)	...	১৫৲
চাল দশ সের ...	...	৭৷৷৹
বাজার ...	...	৩০৲
কাপড় ১ জোড়া ...	...	১০৲
লটারির টিকিট ...	...	৫৲
সর্বসিদ্ধি কবচ ...	...	৫৲
ভাগ্যলক্ষ্মী মাদুলী ...	...	৫৲
কয়লা আধ মণ ...	...	১৷৷৹
অন্যান্য ...	...	১৲
		৮০৲

(৬) ১৯৪৩ আগস্ট

বাড়ি ভাড়া ...	...	১৫৲
পরিবার দেশে পাঠানোর খরচ—	...	১২৲
স্ত্রীর হাতে দেওয়া গেল—	...	৫১৸৹
দড়ি ও কলসি (শস্তায় কোথাও মিলিল না)		১৷৹
		৮০৲

ভাঙন

শ্রীপরিমল গোস্বামী

ষষ্ঠীচরণ সংসারটিকে বেশ গুছিয়ে এনেছিল। কিন্তু হঠাৎ সব গোলমাল হ'য়ে গেল। বাইরের জগতের কোনো খবরই সে রাখে না, এইটুকুমাত্র সে জানে যে যুদ্ধ হচ্ছে, জার্মানির সঙ্গে আর জাপানের সঙ্গে। কোথায় জার্মানি আর কোথায় জাপান তার কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই তার। ইংরেজের দেশ কোথায় তাও সে ভাল ক'রে জানে না।

জিনিসপত্রের দাম চড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন, মনোহারী দোকানের ব্যবসা আর যে চলে না। যুদ্ধ যে কবে শেষ হবে!

পনেরোটি বছর সে নিজহাতে উপার্জন করে এসেছে। মনোহারী দোকান তার বড় নয়—খুবই ছোট, এমন ছোট যে সমস্ত দোকানটি মাথায় বয়ে এক ক্রোশ দূরের হাটে সপ্তাহে দুবার বেশ যাওয়া চলে। এই ব্যবসায়ে তার হাতে কিছু জমেওছিল, কিন্তু সে টাকা তার দু'বছর আগে খরচ হয়ে গেছে। অর্থাৎ হাতের টাকা খরচ করেই তাকে ঘরে লক্ষ্মী আনতে হয়েছে। ইতিমধ্যে ছেলেও হয়েছে একটি।

এই ভাবে চলতে চলতে ভাণ্ডার শূন্য হয়ে কখন দেশের সকল ধান ফুরিয়ে গেছে ষষ্ঠীচরণ বুঝতে পারেনি—সংসার পথে সে চলছিল একরকম গায়ের জোরেই। তার মনে ছিল আনন্দ, দেহে ছিল শক্তি, কোনো দুঃখকেই সে কখনও গায়ে মাখেনি। কিন্তু সে এখন প্রতিপদে একটা অজ্ঞাত হাতের আকর্ষণ অনুভব করতে আরম্ভ করেছে। সংসার পথে পিছনে তার কোনো টান ছিল না, কিন্তু এখন কে যেন তাকে প্রচণ্ড জোরে টেনে ধরে রাখছে। সে আগের মতো লঘুচিত্তে এগিয়ে যেতে পারছে না।

একটা যেন প্রকাণ্ড বোঝা তার মাথার উপর চেপে বসেছে—সোজা হ'য়ে দাঁড়াতেও পারছে না। এ টান ঠিক পিছনের নয়, এ টান নিচের দিকে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যেন দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যে পয়সায় সে চাল কিনত, যে পয়সায় সে নিত্য প্রয়োজনীয় আর সব জিনিস কিনত, সে পয়সা কমে এসেছে অনেকখানি—কিন্তু যে পয়সা তার হাতে আসছে তা দিয়ে কোনো কিছুই সে আর কিনতে পারছে না।

এমন অবস্থা কি দেশের সত্যিই হতে পারে? না, নিশ্চয় কোথায়ও

কোনো ভুল হয়েছে। কানে আসছে বটে দেশের ধান চাল ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু এমন নিঃশেষে ফুরিয়ে যেতে পারে এ তার বিশ্বাস হয়নি প্রথম প্রথম। কিন্তু বিশ্বাস না করে উপায় কি? সে দেখছে তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে, লক্ষ্মীর চেহারা শুকিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটি মৃত্যুর দ্বারে এসে পৌঁছেছে। মায়ের বুকে দুধ নেই, দেশে গোরুও ফুরিয়ে গেছে—গোরুর দুধও মেলে না।

ভেবেছিল ছেলেটিকে বার্লি খাইয়ে রাখবে, কিন্তু বার্লি কেনাও তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। ঘরে চালও আর রইল না, বাইরেও চাল মেলা অসম্ভব। সম্মুখে হঠাৎ ঘোর অন্ধকার।

ষষ্ঠী ছেলেবেলায় তাদের বাড়ির পাশের সেকরার দোকানে ব'সে সোনারুপা গলানো দেখত। বড় একখণ্ড ধাতু মাটির পাত্রে আগুনের উপর বসানো আছে। সেকরা 'জাঁতা' দিয়ে হাওয়া দিচ্ছে, আগুনের তেজ ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। তার উপর মুখে নল লাগিয়ে ফু' দিচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধাতুখণ্ডের নিচের দিকটা গলতে আরম্ভ করল—গলে জলের মত হয়ে গেল, কিন্তু উপরের অংশ তখনও শক্ত। কিছুক্ষণের মধ্যেই উপরের অংশও দ্রুত ডুবে গেল সেই তপ্ত তরল ধাতুর মধ্যে—তখন সবটাই গলে টলমল করতে লাগল সেই পাত্রে।

ষষ্ঠীর আজ সে কথাই কেবল মনে পড়ছে। তার পায়ের নিচে যেন হাপরের আগুন—পায়ের দিকটা গলতে সুরু করেছে—কিন্তু দেহের উপরের অংশ তখনও গলেনি—তাই সে বুঝতে পারেনি তার ঠিক নিচেই কি সর্বনাশ বাসা বেঁধেছে, এইবার সে দ্রুত ভেঙে পড়বে নিচের গলিত অংশের উপর। ষষ্ঠীর মাথাটা ঘুরে উঠল, সে আর ভাবতে পারল না।

"আর তো চলে না বৌ, এভাবে ঘরে বসে মরার চেয়ে চল সবাই বেরিয়ে পড়ি, যে দিকে দু' চোখ যায়।—ভেবে দেখেছি গাঁয়ে থাকা আর চলবে না।"—ষষ্ঠীচরণের কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক দৃঢ়তা।

লক্ষ্মী মৃতপ্রায় ছেলেটির দিকে চেয়ে রইল, কোনো কথাই বলতে পারল না। বলার কিই বা আছে।

ষষ্ঠী বিরক্তভাবে বলল, "ঐতো আমাদের শত্তুর, পায়ে শেকল বেঁধে ঘরে পুরে রাখবে—আর সবাই মিলে এক সঙ্গে শুকিয়ে মরব!—সে হবে না রে—ওকে ঘাড়ে নিয়েই বেরুতে হবে।"

বলল সহজেই, কিন্তু কাজে সহজ ছিল না—অর্থাৎ তিন বছরের

ছেলেকে ঘাড়ে বয়ে পথ হাঁটার ক্ষমতা আর ষষ্ঠীচরণের ছিল না।

বিষম সমস্যা!

কিন্তু সমস্যার সমাধানও হল খুব সহজে।

একটু না কেঁদে, এক বছরের অস্তিত্বের জন্য কোনো প্রতিবাদ না করে, বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে কোনো নালিশ না জানিয়ে, সম্পূর্ণ নীরবে, ছেলেটি তার বাপ-মাকে মুক্তি দিয়ে গেল দু'দিনের মধ্যেই।

মুক্তি—এমন মুক্তি যে ওরা এত শীগগির পাবে তা ভাবতেই পারে নি। জীবিত শিশু চোখের সমুখে ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল। তাকে আরও দু'দিন বাঁচিয়ে রাখলে ওদের কি লাভ হত? মুমূর্ষু শিশুর দুর্বল ক্ষীণ দ্রুত নিশ্বাস চোখের সম্মুখে আরও দু'দিন বেশি দেখলে মায়ের বুকে কি সান্ত্বনা জাগত?

ষষ্ঠী ভিক্ষায় বেরিয়ে খালি হাতে ফিরে এল, গ্রামে কোথায়ও ভিক্ষা মিলল না। কে ভিক্ষা দেবে? গ্রাম শ্মশান হয়ে গেছে। গ্রামের লোক সবাই পথে এসে দাঁড়িয়েছে। ষষ্ঠী নিজে চোখে দেখে এল এক একটা পরিবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে শহরে যাবে বলে। সবাই বলছে শহরে না গেলে আর খেতে পাওয়া যাবে না, কলকাতা শহরে যেতে হবে। সেখানে নাকি লোকদের ঘরে ঘরে খাবার—ঘরে ঘরে অতিথি-সেবা—পথের মোড়ে মোড়ে অন্নসত্র. একবার কোনো রকমে গিয়ে সেখানে পড়তে পারলেই হয়।

ঘর-ভাঙা, পরিবার-ভাঙা কঙ্কাল-পালের শোভাযাত্রা চলল শহরের দিকে। যুবক, যুবতী, শিশু, বৃদ্ধ,—কিন্তু ভাগ্যের নির্মম আঘাতে আজ সবাই মুমূর্ষু, সবাই চলচ্ছক্তিহীন,—তবু তাদের চলতে হচ্ছে সেই অন্নসত্র মরীচিকা লক্ষ্য করে। বাংলা দেশ তেমনি শ্যামল—তেমনি সরস—কিন্তু তবু আজ মরুভূমি—চারিদিকে ধু ধু করছে।—বোধ হয় মরুভূমির চেয়েও ভয়ঙ্কর—মরুভূমির উত্তপ্ত বালি থাকে পায়ের নিচে—কিন্তু বাংলা মরুভূমির উত্তপ্ত অদৃশ্য বালি উড়ে এসে জমছে সবার মুখের মধ্যে, গলার মধ্যে, আর জমছে পেটে।

ষষ্ঠীচরণ আর লক্ষ্মী এসে পেঁছিল কলকাতা শহরে। কাউকে আর মানুষ বলে চিনতে পারে না। কারো চেহারার সঙ্গে কারো চেহারার কোনো তফাৎ নেই—কারো বয়সের সঙ্গেও যেন কারো বয়সের তফাৎ নেই।

দু'জনে শহরের মধ্যে মৃত্যুর মুখোমুখী এসে দাঁড়াল।

কুৎসিত বীভৎসতা! লক্ষ্মীর দম বন্ধ হয়ে আসে। হাজার হাজার মৃতকল্পের শ্মশানে বসে সে অস্থির হয়ে ওঠে। কোনো রকমে একটা ফুটপাথ আশ্রয় করে দু'জনে এসে শুয়ে পড়ল সেখানে। পাশে একদল ভিখারী পড়ে আছে। কয়েকজন একেবারেই নড়তে পারছে না, বোধ হয় তখুনি মরবে। দু'চার জন বসে বসে ভিক্ষে-করে-আনা কয়েকটা ভাত ভাগাভাগি করে খাচ্ছে।

এই শহরে তারা কেন এল?

লক্ষ্মী শিউরে উঠল। ছোট ছোট শিশুদের কংকাল দেখে ক্ষণকালের জন্য তার নিজের সন্তানের কথা মনে এসেছিল, কিন্তু না—আর তার দুঃখ নেই, জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে সব পার্থক্য আজ তার ঘুচে গেছে। ছেলেটি মরে বেঁচেছে, বেঁচে থাকলে তাকেও এইখানে এনে শোয়াতে হত। সে আজ নেই ভাবতেও লক্ষ্মীর খুব আরাম বোধ হল।

ওরা একবেলা ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যার দিকে পেল কিছু ভাত। তাই খেয়ে রাত্রিটা কোনো রকমে কাটাল। খেয়ে আরও দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তাই ঘুমিয়ে পড়েছিল সহজেই।

সকালে উঠে লক্ষ্মীর যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। সে কে, কোথায় সে এসেছে এসব কথা তার যেন কিছুতেই মনে পড়তে চায় না। সে থেকে থেকে চমকে উঠতে লাগল।

দৃষ্টি আজ তার অনেকটা স্পষ্ট। তার মনে হতে লাগল সমস্ত শহর একটা প্রকাণ্ড ক্ষুধার্ত রাক্ষসের মতো হাঁ করে আছে, পথের ধুলো ছাড়া খাবার কিছু নেই।

এত লোক আজ পথে বসেছে। এত লোকের কপাল ভেঙেছে, এত লোকের সংসারে আগুন লেগেছে! এ না দেখলে সে কোনো দিনই বুঝতে পারত না। মৃত্যুতে আর দুঃখ কোথায়? মৃত্যুই তো সহজ, মরে যাওয়াই স্বাভাবিক।

কলকাতার ঐশ্বর্য যেন এই শ্মশানের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। বিরাট ঐশ্বর্যের স্রোত বয়ে চলেছে বিরাট শ্মশানের কূলে। শহর পাষাণ, প্রাণহীন। হিমালয়ের মতো বিরাট, বিস্ময়কর, কিন্তু মানুষ তার পায়ে মাথা কুটে মলেও সেই পাষাণ তেমনি নির্বিকার। লক্ষ্মী চেয়ে চেয়ে দেখছিল শহরের রূপ। কিন্তু মন ভুলল না।

বাড়ির তেতলা থেকে রেডিও-র গান আসছে তার কানে। কিন্তু সে

গান তার প্রাণ স্পর্শ করে না। পাশ দিয়ে একের পর এক মোটর ছুটে চলেছে—যেন চোখ বন্ধ করে—যেন নোংরা শ্মশানভূমিটি পার হয়ে যেতে পারলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। মোটর গাড়ির দৃশ্য আনন্দ জাগায় না—তার গতিতে কেবল ধুলো উড়ে এসে লাগে চোখ-মুখে। আর সে ধুলো উড়ে এসে ঢোকে শুষ্ক বিস্বাদ জিহ্বায়।

ঝম ঝম করে বৃষ্টি নেমে পড়ল। এত বৃষ্টির মধ্যে এমন অসহায়ের মতো ওরা কখনো ভেজেনি কিন্তু আজ কিছুই অস্বাভাবিক মনে হল না। উঠে কোথাও আশ্রয় নেবে এমন কল্পনাও হল না। সবাই নির্বিকার ভাবে ভিজছে। কনট্রোলের দোকান থেকে চাল নেবার জন্য যারা সমস্ত রাত লাইন করে বসেছিল তারাও ঠায় ভিজছে। ভিখারীদের মধ্যে কেউ জ্বরে সংজ্ঞাহীন, কেউ নিউমোনিয়ায় ছটফট করছে—সবাই নির্বিকার চিত্তে ভিজছে—রোদে বসেও তারা এমনি ভাবেই পুড়েছে কাল সারাদিন।

বৃষ্টির মধ্যে স্ত্রীকণ্ঠের কাতর ধ্বনি আসতে লাগল লক্ষ্মীর কানে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শব্দ থেমে গেল। ভিখারী-মহলে একটা চাঞ্চল্য জেগে উঠল। একটু দূর থেকে কয়েকজন স্ত্রীলোক ধীরে ধীরে উঠে এল সেদিকে—লক্ষ্মী দেখতে পেল একটি স্ত্রীলোক তার ছেঁড়া শাড়ির একটা অংশ ছিঁড়ে দিচ্ছে শায়িত স্ত্রীলোকটিকে। শোনা গেল নবজাত শিশুর কান্না।

লক্ষ্মী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

ষষ্ঠীচরণ শুয়েই পড়ে আছ সকাল থেকে—তার কোনো দিকেই দৃষ্টি নেই। লক্ষ্মী তাকে ডেকে বলল, "বেলা হয়ে এল, সবাই তো উঠছে, আমাদেরও বেরুতে হয় এখন।"

"পারবি হাঁটতে?" ষষ্ঠীচরণ উদাসীন ভাবে বলল।

লক্ষ্মী ধীরে ধীরে কম্পিত পদে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "পারব।"

ওরা দুজনে ধীরে ধীরে উঠল, গৃহস্থদের খাবার সময় হয়েছে, দরজায় গিয়ে "মা গো"—বলে চেঁচাতে চেঁচাতে একটুখানি ফেন বা দু'চারটে ভাতের কণা পাওয়া যাবে।

লক্ষ্মী কিন্তু বেশি দূরে যেতে পারল না। দু'জনেই কাছাকাছি একটা বাড়ির দরজায় বসে ঘণ্টা-দুই চেঁচাল। সেখানে আরও ভিখারী ছিল, তারাও চেঁচাচ্ছে—"মা গো—দু'টি খেতে দাও মা।—"

এমনি ভাবে চলতে লাগল দিন। আর যত চলতে লাগল, ততই

ওদের চলার শক্তি কমে আসতে লাগল। দু'জনে এক পাড়া থেকে আর এক পাড়া—এমনি করে একটু একটু করে সরে সরে শহরের আরও এক অংশে এসে পৌঁছল। যখন যেখানে খাবার জোটে সেখান থেকে আর শোবার জায়গায় ফিরে আসতে পারে না, নতুন শোবার জায়গা করে নিতে হয় তারই কাছাকাছি কোনো জায়গায়।

এক একদিন চব্বিশ ঘণ্টা পরে একটুখানি ভাতের ফেন পায়। কিন্তু এরকম খাওয়ায় এক বিপদ। অনাহার সহ্য হয়, কিন্তু অনাহারের পর কিছু খেলেই দেহ হঠাৎ দুর্বল হয়ে পড়ে খুব বেশি। সে দিন এমনি হল। লক্ষ্মী একটুখানি ফেন খেয়ে সেখানেই পড়ে রইল—ষষ্ঠীচরণও বাধ্য হয়ে রইল তার কাছে—অথচ থাকবার মতো জায়গা সেটা নয়।

পরদিন লক্ষ্মী আর উঠতে পারল না। অগত্যা ষষ্ঠীচরণকে একাই বেরুতে হল, একই জায়গায় বার বার চাইলে যে কিছু পাওয়া যায় না।

ষষ্ঠীচরণ যাবার সময় বলে গেল, "তুই থাক তা হলে, আমিই যাই, কিছু পেলে নিয়ে আসব এখানে।"

কিন্তু ষষ্ঠীচরণ আর ফিরল না।

ভিক্ষে করতে করতে সে দিশাহারা হয়েছে। শহরের পথ কুহক জানে। তা ছাড়া সেও তো ক্ষীণ, দুর্বল, কোথায়ও গিয়ে সেখান থেকে আর চলতে পারেনি।

পরিবারের তিনটি প্রাণী। একটি গেল মরে, আর বাকী দু'জন বিরাট শহরের বিরাট জনতার মধ্যে গেল হারিয়ে।

হাজার হাজার পরিবার কেন্দ্রচ্যুত হয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মতো। এর মধ্যে ষষ্ঠীচরণ লক্ষ্মীর কোনো পরিচয় নেই।

ভিখারীর কি কোনো পরিচয় আছে? তারা জন-মরুভূমির এক এক কণা বালি। তারা ধনীর বাড়ি গিয়ে বলে ভগবান তোমাকে ভাল করবেন, ভগবান তোমাকে রাজা করবেন—আর এই প্রার্থনা জানিয়ে একমুঠো অন্নের সংস্থান করে। ভগবান তাদেরও কেন ভাল করেননি, তাদেরও কেন রাজা করেননি, এ প্রশ্ন কিন্তু তাদের মনে জাগে না। এ যে তাদের কর্মফল। কিন্তু ধনীর কর্মফল নেই কেন?

এ কথা কি ভিখারী ভাবে? না, ভাবে না। ভাবলে বোধ হয় ভিক্ষা করতে পারত না। তখন মনে হত তারাও মানুষ, বাঁচার অধিকার তাদেরও

আছে, রাজা হওয়ার অধিকার তাদেরও আছে। আজ যারা মানুষের হাতে মার খেয়ে মৃত্যুতীর্থে যাত্রা করেছে তাদেরও বাঁচার অধিকার আছে।

লক্ষ্মী পড়ে রইল পথের ধারে। যার মনে ক'দিন আগে কত আশা ছিল, যার বুকভরা স্নেহ ছিল, যার কাছে পৃথিবী সুন্দর ছিল, জীবন যার কাছে সার্থক মনে হয়েছিল, আজ তার কাছে সব অর্থহীন। আজ সে মানুষের জগৎ থেকে বহু দূরে সরে গেছে। শহরের ঘরে ঘরে চলছে উৎসব, পথে পথে চলছে সুখী মানুষের স্রোত,—কত স্বাস্থ্যবান পুরুষ, কত স্বাস্থ্যবতী স্ত্রীলোক, কত আনন্দমুখর শিশুর মেলা—কিন্তু কে তারা? কে সে তা ভাবতেও পারে না। কিন্তু তার কোনো দুঃখও হয় না সেজন্য। সে বুঝতে পেরেছে দুটো জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক, সে যে-জগতের মানুষ, তা থেকে ওদের জগৎ বহু বহু যোজন দূরে। সে জানে ওদের কাছে শুধু চাইতে হয়, ইচ্ছা হলে কিছু দেয়, না হলে দেয় না। তাই, তারা যখন কিছু দেয় তখন মনে কোনো কৃতজ্ঞতা আসে না, যখন দেয় না তখন কোনো দুঃখই হয় না।

লক্ষ্মীর মন অসাড় হয়ে গেছে। স্বামী কোথায় চলে গেল, বেঁচে রইল কি মরে গেল তাও তার কাছে আজ অর্থহীন। সে চেষ্টা করেও কিছু ভাবতে পারছে না।—মাঝে মাঝে তার হাসি পাচ্ছে—মনে হচ্ছে সে পাগল হয়ে যাবে। সামান্য ক'দিনের তফাতে সংসার তার কাছে এমন বদলে গেল কি করে! সে যেন মরে গিয়ে নতুন করে জন্মেছে। এক একবার মনে হয় সে মরেই গেছে—আর তার প্রেতাত্মা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে শহরের শ্মশানে।

এমনি সব এলোমেলো চিন্তার মধ্যে সে যখন নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে, তখন সে জোর করে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে', ভাবনা-চিন্তা বন্ধ করে, কোনো-কিছুর দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

বসে বসে কত কি অদ্ভুত দৃশ্য দেখে সে। দেখতে দেখতে আবার তার মনে সন্দেহ জাগে সে বেঁচে আছে কি না।

গৃহস্থ বাড়ির ঝি উচ্ছিষ্ট ফেলে দিয়ে গেল পথের ধারে, এক ভিখারীতে আর এক কুকুরে তাই নিয়ে পড়ল কাড়াকাড়ি।

ছোট্ট একটি উলঙ্গ ভিখারী বালক খাবারের খালিঠোঙা পরম আগ্রহে চেটে চেটে খাচ্ছে।

এ সব দৃশ্য এ জগতে সে কখনও দেখেনি। এ নিশ্চয় ভিন্ন জগৎ,

প্রেতের জগৎ। লক্ষ্মী আর দেখতে পারে না, দু'হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে।

মনে হয় চোখ খুললে সব দৃশ্য বদলে যাবে—মায়া-ছবি মিলিয়ে যাবে—কিন্তু হায় রে দুরাশা!

আর কটা দিন? জীবনের মেয়াদ তার আর নেই, জীবনের উপর মায়াও তার নেই। সহস্র আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম আর সফলতার সম্ভবনাপূর্ণ সুস্বাদু জীবনটা এমন স্বাদহীন হতে পারে এ কল্পনাও তার মনে আসেনি কখনও। সে পড়ে রইল আর এক জীবনের অপেক্ষায়, মানুষ নয়—ঠিক যেন একটা রুগ্ন কুকুর পড়ে আছে পথের পাশে।

কিন্তু তার মরা হল না।

পাড়ায় একটা তৎপরতা জেগে উঠল।

ভিখারীদের চোখেমুখে দেখা গেল একটা দীপ্তি। মুমূর্ষু উঠে বসল, মরতে মরতেও তাদের মনে জাগল জীবনের আশা।

এই পাড়াতেই অন্নসত্র খোলা হচ্ছে।

যুদ্ধের বাজারে হঠাৎ-লক্ষপতি-হওয়া এক পুণ্যলোভী ধনী অন্নদান সেবায় অগ্রণী হলেন। অর্থলাভে যদি কিছু পাপ হয়ে থাকে অন্নদানে তার পনেরো আনা দূর হয়ে যাবে এই তাঁর ধারণা। পৃথিবীতে দয়া-ধর্মের জন্যই নিঃস্বদের অস্তিত্ব। নিঃস্ব হাভাতে না থাকলে পৃথিবী থেকে এত বড় ধর্মটা লোপ পাবে! দুর্ভিক্ষের জন্য এদেশে অনেকের পুণ্য-মুনাফা চোরা বাজারের মুনাফার মতোই বেড়ে উঠল এই ভাবে।

ইহকাল পরকাল দু'দিকেই তাঁদের অনেক জমল। বহু দিন আর তাঁদের কিছু করতে হবে না। কিন্তু মন্দ কি? ভিখারীরা তো কৃতজ্ঞ হল!

ব্যবস্থা হল সেখানে প্রতিদিন একশ জন ভিখারী এক বেলা খিচুড়ি খেতে পাবে!

খিচুড়ি বিতরণের আগে প্রথম-আসা একশ ভিখারীর মধ্যে বেলা এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে একশখানা টিকিট বিলি হবে, প্রতিদিন সেই টিকিট নিয়ে তাদের খেতে হবে।

লক্ষ্মীও সেই পাড়াতে থাকে। বহুকাল পরে সে এইখানে প্রথম পেট ভরে খেতে পেল।

লক্ষ্মীর যেন জন্মান্তর ঘটল। একটুখানি সুস্থ বোধ করতেই প্রথম মনে পড়ল তার ছেলে আর স্বামীর কথা। আশ্চর্য মানুষের মন!

বুক ভেঙে যেতে লাগল লক্ষ্মীর। এতদিন তার দুঃখও ছিল না, কান্নার ক্ষমতাও ছিল না। এতদিন পরে সে প্রথম বুঝতে পারল তার কেউ নেই।

রোজ এখানে খেতে পাবে এই বিশ্বাস মনে জাগতেই সংসাবেব উপব তাঁর বিশ্বাস ফিরে এল, আবার সব ভাল লাগতে লাগল।

কিন্তু হায় এমন সুখের দিনে আজ সে একা! হে ঠাকুর, এক বেলা সে খেতে পাবে এমন সৌভাগ্য তার কেন দিলে স্বামী-পুত্র হারানোর পর!

লজ্জা হল না লক্ষ্মীর এ কথা ভাবতে! হায় রে, এখনও সে সুখের আশা করে!

কদিন সামান্য খেয়েই তার চেহারা ফিরল, তার কঙ্কালের উপর একটুখানি শ্রী ফুটে উঠল, তাকে দেখে পাড়ার লোকের দয়া হল। নতুন কাপড় পরিয়ে, থাকবার জায়গা দিয়ে, তাকে অন্নসত্রে পরিবেশনের কাজে নিযুক্ত করা হল। তার বদলে সে দুবেলা খেতে পাবে।

প্রতিদিন শত শত ভিখারীর ভীড় হয়, তাদের মধ্যে একশখানা টিকিট বিলি করা হয়—যারা বাকী থাকে তাদের কিছুই দেওয়া যায় না, তারা ঘেরা জায়গার বাইরে দাঁড়িয়ে চীৎকার করতে থাকে।

লক্ষ্মী যন্ত্রের মতো কাজ করে যায়—কোনো কথা বলে না, ভাল করে আর খেতেও পারে না।

অন্নসত্র পরিচালকেরা জিজ্ঞাসা করেন, "লক্ষ্মীর কি হল?" লক্ষ্মী শুধু বলে, "কিছুই হয়নি।"

কি করে সে তাদের বোঝাবে কি সর্বনাশ তার হয়েছে। তার স্বামী কোথায় পড়ে আছে—দ্বারে দ্বারে হয়তো সে চেঁচিয়ে ফিরছে, "মা গো দুটো খেতে দাও মা।"—

কিংবা হয়তো সে আর বেঁচে নেই। এ কথা ভাবতে গেলে লক্ষ্মীর মাথা ঘুরে ওঠে, চতুর্দিক অন্ধকার দেখে।

প্রতিদিন সে ভিখারীদের মধ্যে স্বামীকে খোঁজে। এখন আর সে তাদের মুখের দিকে তাকাতে সাহস করে না। সে ভাবতে চেষ্টা করে যারা প্রতিদিন খেয়ে যাচ্ছে তাদের মধ্যে তার স্বামীও আছে।

এ ধারণা ভুল হয় হোক, কিন্তু সে ভুল সে ভাঙতে চায় না।

সে প্রাণপণে বিশ্বাস করতে চায় তার স্বামী রোজ এসে তার হাতে খেয়ে যাচ্ছে।

কোনো ভিখারীকেই সে ভাল করে দেখে না, পাছে তার ভুল ভেঙে যায়।

মাঝে মাঝে সে প্রার্থনা করে, "ঠাকুর, আমার চোখ দুটো অন্ধ করে দাও।"

লক্ষ্মীর মন ভেঙে পড়ে, তার স্বাস্থ্য আবার খারাপ হতে থাকে, সবাই তাকে নিয়ে বিব্রত হয়।

লক্ষ্মী শুধু বলে, "আমার কিছুই হয়নি"—ব'লে আবার কাজে লাগে।—প্রতিদিন কাজের সময় এক আশ্চর্য শক্তি জেগে ওঠে তার মধ্যে। অকাতরে সে একশ ভিখারীকে অন্ন পরিবেশন করে। তার স্বামী তাকে একদিন এই ভীড়ের ভিতর থেকে "লক্ষ্মী" বলে তাকে ডাকবে এই বিশ্বাস তাকে বাঁচিয়ে রাখে।

নির্বোধ লক্ষ্মী! সে জানে না কি বিরাট সর্বনাশের আবর্ত জেগে উঠেছে তার চারিদিকে।—এই আবর্তে একবার যে ছিটকে এসে পড়েছে, এ জীবনে আর তার সন্ধান পাওয়া যাবে না। লক্ষ্মী নির্বোধ, তাই সে কল্পনা করে আবার তার স্বামীকে সে ফিরে পাবে, আবার দেশে ফিরে গিয়ে ঘর বাঁধবে, তাই সে মনে করে অন্ধকার মিথ্যা, আলোই সত্য!

অঙ্গার

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

বছর আষ্টেক হোলো দিল্লীতে আমি চাকরি করছি। কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক কম। কোনো কোনো বছরে কলকাতায় এক আধবার আসি, ঘুরে বেড়িয়ে, সিনেমা দেখে আবার ফিরে চলে যাই। নৈলে, ইদানীং আর আসা হয়ে ওঠে না!

বছর তিনেক আগে ফরিদপুর থেকে শোভনা আমাকে চিঠি লিখেছিল—ছোড়দাদা, তুমি নিশ্চয় শুনেছ আজ ছ'মাস হতে চললো আমার কপাল ভেঙেছে। ছেলেটাকে নিয়ে কিছুদিন শ্বশুর বাড়িতে ছিলুম কিন্তু সেখানেও আর থাকা চললো না। তোমার ভগ্নিপতি এক আধশো টাকা যা রেখে গিয়েছিলেন, তাও খরচ হয়ে গেল। আর দিন চলে না। তুমি আমার মামাতো ভাই হলেও তোমাকে চিরদিন সহোদর দাদার মতন দেখে এসেছি। ছেলেটাকে যেমন করে হোক মানুষ করে তুলতে না পারলে আমার আর দাঁড়াবার ঠাঁই কোথাও থাকবে না। এদিকে যুদ্ধের জন্য সব জিনিসের দাম ভীষণ বেড়ে গেছে। নুটু পাস করে চাকরি খুঁজছে, এখনো কোথাও কিছু সুবিধে হয়নি। মা ভেবে আকুল। ইস্কুলের মাইনে দিতে না পারায় হারুর পড়া বন্ধ হয়ে গেল। বাবার কোম্পানীর কাগজ ভেঙে সব খাওয়া হয়ে গেছে। তুমি যদি এ অবস্থায় দয়া করে মাসে মাসে দশটি টাকা দাও তাহ'লে অনেকটা সাহায্য হতে পারে। ইতি—

দিল্লীতে আমার এই চাকরির খোঁজ প্রথম পিসেমশায় আমাকে দেন, সুতরাং শোভনার চিঠি পেয়ে স্বর্গত পিসেমশায়ের প্রতি আমার সেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতাটা হৃদয়াবেগের সঙ্গে ঘুলিয়ে উঠলো। সেই দিনই আমি পঁচিশটি টাকা পাঠিয়ে দিলুম এবং শোভনাকে জানালুম, তোর ছেলে যতদিন না উপার্জনক্ষম হয়, ততদিন প্রতিমাসে আমি তোর নামে পনেরো টাকা পাঠাবো।

সেই থেকে শোভনা, পিসিমা, নুটু, হারু—সকলের সঙ্গেই আমার চিঠি পত্রে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পুজোর সময় এবং নতুন বছরের আরম্ভেও আমি কিছু কিছু টাকা তাদের দিতুম। তিন বছর এই ভাবেই চলে এসেছে।

ইতিমধ্যে যুদ্ধের গতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের কি প্রকার অবস্থা

দাঁড়িয়েছে, অথবা শোভনারা কিভাবে তাদের সংসার চালাচ্ছে, এর পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ খবর আমি নিইনি, দরকারও হয়নি। মাঝখানে বোমার ভয়ে যখন কলকাতা থেকে বহুলোক মফঃস্বলের দিকে এখানে ওখানে পালিয়েছিল, সেই সময় শোভনার চিঠিতে কেবল জানতে পেরেছিলুম, ফরিদপুরে জিনিসপত্রের দর খুব বেড়ে গেছে। অনেক লোক এসেছে—ইত্যাদি। কিন্তু টাকা আমি নিয়মিত পাঠাই, নিয়মিত প্রাপ্তিস্বীকার এবং চিঠি পত্রও আসে। যা হোক এক রকম করে শোভনাদের দিন কাটছে।

কিন্তু প্রায় ছ'মাস আগে মাসিক পনেরো টাকা পাঠাবার পর দিন কয়েক বাদে টাকাটা দিল্লীতে ফেরৎ এলো। জানতে পারলুম ফরিদপুরের ঠিকানায় পিসিমারা কেউ নেই। কোথায় তা'রা গেছে, কোথায় আছে, কিছুই জানা যায় নি। চিঠি দিলুম, তার উত্তর পাওয়া গেল না। আর কিছুকাল পরে আবার মনিঅর্ডারে টাকা পাঠালুম, কিন্তু সে টাকাও যথাসময়ে ফেরৎ এলো। ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে না পেরে চুপ করে গিয়েছিলুম। ভাবলুম, টাকার দরকার হলে তা'রা নিজেরাই লিখবে, আমার ঠিকানা ত' আর তাদের অজানা নয়।

কিন্তু আজ প্রায় তিনবছর পরে হঠাৎ কলকাতায় যাবার সুযোগ হোলো এই মাত্র সেদিন। আমাদের ডিপার্টমেণ্টের সাহেব যাচ্ছেন কলকাতায় তদ্বির-তদন্তের কাজে। আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। ভাবলুম, এই একটা সুযোগ। সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে কোনো একটা শনিবারে যাবো ফরিদপুরে, সোমবারটা নেবো ছুটি—দিন দুয়েকের মধ্যে দেখাশোনা করে ফিরবো। একটা কৌতূহল আমার প্রবল ছিল, যাদের বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে কোনো সংস্থান হবার কোন আশা নেই, সেই দরিদ্র পিসিমা আর শোভনা পনেরো টাকা মাসোহারার প্রতি এমন উদাসীন হোলো কেন? শুনেছিলুম, ফরিদপুর টাউনে ইতিমধ্যে কলেরা দেখা দিয়েছিল; তবে কি তাদের একজনও বেঁচে নেই? মনে কতকটা দুর্ভাবনা ছিল বৈ-কি।

সাহেবের সঙ্গে কলকাতায় এলুম এবং এসে উঠলুম পাঁচগুণ খরচ দিয়ে এক হোটেলে। এসে দেখছি এই বিরাট মহানগর একদিকে হয়ে উঠেছে কাঙ্গালীপ্রধান ও আর একদিকে চলছে যুদ্ধসাফল্যের প্রবল আয়োজন। ফলে, যারা অবস্থাপন্ন ছিল তারা হয়ে উঠেছে বহু টাকার মালিক, আর যারা গরীব গৃহস্থ ছিল, তারা হয়ে এসেছে সর্বস্বান্ত। দেশের সবাই বলছে, দুর্ভিক্ষ; গবর্নমেণ্ট বলছেন, না, এ দুর্ভিক্ষ নয়, খাদ্যাভাব। দুটোর মধ্যে

তফাৎ কতটুকু সে আলোচনা আপাতত স্থগিত রেখে সপ্তাহখানেক পরে আমার কর্তব্যস্রোতে গা ভাসিয়ে দিলুম। এর মধ্যে আর কোনো দিকে মন দিতে পারিনি। এই ভাবেই চলছিল। কিন্তু ছোট পিসির মেঝ ছেলে টুনুর সঙ্গে একদিন শেয়ালদার বাজারের কাছে হঠাৎ দেখা হয়ে যেতেই কথাটা আবার মনে পড়ে গেল। একটা ফুলকাটা চটের থলেতে সের পাঁচেক চাল আর বাঁ-হাতে ডাঁটাশাক নিয়ে সে বিকেলের দিকে পথ পেরিয়ে যাচ্ছিল। দেখা হতেই সে থমকে দাঁড়ালো। বললুম, কিনে টুনু?

চমকে সে ওঠেনি, কিছুতেই বোধ হয় সে আর চমকায় না। কেবল তার অবসন্ন চোখ দুটো তুলে সে শান্তকণ্ঠে বললে, কবে এলে ছোড়দা?

তার হাত ধরে বললুম, তোদের খবর কি রে?

খবর?—বলে সে পথের দিকে তাকালো। কসাইখানার মিলিটারি মৃত্যুপথযাত্রী রুগ্ন গাভীর মতো দুটো নিরীহ তার চোখ; যেন এই শতাব্দীর অপমানের ভারে সে-চোখ আচ্ছন্ন। মুখ ফিরিয়ে বললে, খবর আব কি? কিছু না।

হাসিমুখে বললুম, একি তোর চেহারা হয়েছে রে? পঁচিশ বছর বয়স হয়নি, এরই মধ্যে যে বুড়ো হয়ে গেলি?

আমার মুখের দিকে চেয়ে টুনু বললে, বাংলা দেশে থাকলে তুমিও হতে ছোড়দা—

কথাটায় অভিমান ছিল, ঈর্ষা ছিল, হতাশা ছিল। বললুম, চাল কিনলি বুঝি?

টুনু বললে, না, আফিস থেকে পাই কনট্রোলের দামে। চারজন লোক, কিন্তু সপ্তাহে ছ'সেরের বেশি পাইনে। এই-ত' যাবো, গেলে রান্না হবে। তোমার খবর ভালো, দেখতেই ত' পাচ্ছি। বেশ আছো।—আচ্ছা; চলি, যুদ্ধ থামবার পর যদি বাঁচি আবার দেখা হবে।

বললুম, শোভনাদের খবর কিছু জানিস? তারা কি ফরিদপুরে নেই?

না—বলে একটু থেমে টুনু পুনরায় বললে, তাদের খবর আমার মুখ দিয়ে শুনতে চেয়োনা ছোড়দা—!

কেন রে? তারা থাকে কোথায়?

বৌবাজারে, তিনশো তেরোর এফ্ নম্বর। হ্যাঁ, যেতে পারো বৈ কি একবার—। আসি তা হলে—এই বলে টুনু আবার চললো নির্বোধ ও ভারবাহী পশুর মতো ক্লান্ত পায়ে।

টুনুর চোখে মুখে ও কণ্ঠস্বরে যে রকম নিরুৎসাহ লক্ষ্য করলুম, তাতে শোভনাদের সঙ্গে দেখা করতে যাবার রুচি চলে যায়। কলকাতায় এসে তারা যদি শহরতলীর আনাচে কানাচে কোথাও ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতো তাহলে একটা কথা ছিল। কিন্তু বৌবাজার অঞ্চলের বাসাভাড়াও ত' কম নয়। একটা কথা আমার প্রথমেই মনে হলো নুটু হয়ত ভালো চাকরি পেয়েছে। আজকাল অন্ন দুর্লভ, চাকরি দুর্লভ নয়। যারা চিরনির্বোধ ছিল, তারা হঠাৎ চতুর হয়ে উঠলো এই সম্প্রতি। একশো টাকার বেশি মাসিক মাইনে পাবার কল্পনা যাদের চিরজীবনেও ছিল না, তারা যুদ্ধ সরবরাহের কনট্রাক্টে সহসা হয়ে উঠলো লক্ষপতি এবং দুর্ভিক্ষকালে চাউলের জুয়া খেলায় কেউ কেউ হোলো সহস্রপতি। হয়ত নুটুর মতো বালকও এই যুদ্ধকালীন জুয়ায় ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলেছে। এ-যুদ্ধে কী না সম্ভব?

ওদের খবর নেব কি নেবো না এই তোলা পাড়ায় আর কাজের চাপে কয়েকটা দিন আরও কেটে গেল। হঠাৎ আফিসের সাহেব জানালেন, আগামী কাল আমাদের দিল্লী রওনা হতে হবে। এখানকার কাজ ফুরিয়েছে।

আমারও এখানে থাকতে আর মন টি'কছিল না। আমার হোটেলের নিচে সমস্ত রাত ধরে শত শত কাঙ্গালীর কান্না শুনে বিনিদ্র দুঃস্বপ্নে এই কটা দিন কোনোমতে কাটিয়েছি—আর পারিনে। দুর্গন্ধে কলকাতা ভরা। তবু এখান থেকে যাবার আগে একবারটি পিসিমাদের খবর না নিয়ে যাওয়ার ভাবনায় মন খুঁৎ খুঁৎ করছিল। বিশেষ করে যাবার আগের দিনটা ছুটি পেলুম জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার জন্য। একটা সুযোগও পাওয়া গেল।

বৌবাজারের ঠিকানা খুঁজে বা'র করতে আমার বিলম্ব হোলো না। মনে করেছিলুম তারা যে-অবস্থাতেই থাকুক না কেন, হঠাৎ গিয়ে দাঁড়িয়ে একটা চমক দেবো। কিন্তু বাড়িটা দেখেই আমি দিশেহারা হয়ে গেলুম। সামনে একটা গেঞ্জী বোনার ঘর, তার পাশে লোহার কারখানা, এদিকে মনিহারি দোকান, ভিতরে ভুষিমালের আড়ৎ। নিচেকার উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখি, নিচের তলাটায় কতকগুলি লোক শোনদড়ির জাল বুনছে ক্ষিপ্রহস্তে। উপর তলাটায় লক্ষ্য করে দেখি বহু লোকজন। ওটা যে মেসবাসা, তা বুঝতে বিলম্ব হোলো না। একবার সন্দেহক্রমে বাড়ির নম্বরটা মিলিয়ে দেখলুম, না, ভুল আমার হয়নি—টুনুর দেওয়া এই নম্বরই ঠিক।

এদিকে ওদিকে দু'চারজনকে ধরে জিগ্‌গেস-পড়া করতে গিয়ে যখন একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলেছি, দেখি সেই সময়ে বছর বারো তেরো বয়েসর একটি মেয়ে সকৌতুকে উপর তলাকার সিঁড়ি বেয়ে মেসের দিকে যাচ্ছে এবং তাকে দেখে চার পাঁচটি লোক উপর থেকে নানা রঙ্গে হাতছানি দিচ্ছে, আমি তাকে দেখেই চিনলুম, সে পিসিমার মেয়ে। তৎক্ষণাৎ ডাকলুম, মীনু!

মীনু ফিরে তাকালো। বললুম, চিনতে পারিস আমাকে?

না।

তোর মা কোথায়?

ভেতরে।

বললুম, আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্ দেখি। এ যে একেবারে গোলকধাঁধাঁ! আয় নেমে আয়।

মীনু নেমে এলো। বললে, কে আপনি?

পোড়ারমুখি! বলে তার হাত ধরলুম,—চল ভেতরে, তোর মা'র কাছে গিয়ে বলব, আমি কে। মুখপুড়ি, আমাকে একেবারে ভুলেছিস?

আমাকে দেখে উপর তলাকার লোকগুলি একটু সরে দাঁড়ালো। বেশ বুঝতে পাচ্ছিলুম, আমার হাতের মধ্যে মীনুর ছোট্ট হাতখানা অস্বস্তিতে অধীর হয়ে উঠেছে। উপরে উঠতে গিয়ে সে বাধা পেয়েছে, এটা তার ভালো লাগেনি। তার দিকে একবার চেয়ে আমি নিজেই তার হাতখানা ছেড়ে দিলুম। মীনু তখন বললে, ওই যে, চৌবাচ্চার পাশে গলির ভেতর দিয়ে সোজা চলে যান. ওদিকে সবাই আছে।

এই বলে সে উপরে উঠে গেল, চোখে মুখে তার কেমন যেন বন্য উদভ্রান্ত ভাব। এই সেদিনকার মীনু, পরনে একখানা পাৎলা সস্তা ডুরে. চেহারায় দারিদ্র্যের রুক্ষ শীর্ণতা—কিন্তু এরই মধ্যে তারুণ্যের চিহ্ন এসেছে তার সর্বাঙ্গে। তার অজ্ঞান চপলতার প্রতি ভীত চক্ষে তাকিয়ে আমি একটা বিষণ্ণ নিঃশ্বাস ফেলে ভিতর দিকে পা বাড়ালুম।

বিস্ময় চমক দেবার উৎসাহ আর আমার ছিল না। সরু একটা আনাগোনার পথ পেরিয়ে আমি ভিতরে এসে দাঁড়িয়ে ডাকলুম, পিসিমা!

কে?—ভিতর থেকে নারীকণ্ঠে সাড়া এলো এবং তখনই একটি স্ত্রীলোক এসে দাঁড়ালো। বললে. কাকে চান্?

অপরিচিত স্ত্রীলোক। রঙ কালো, নাকে নাকছাবি, মুখে পানের দাগ,

পরনে নীল কাঁচের চুড়ি, এই প্রকার স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৌবাজারেই বেশি, বললুম, তুমি কে?—এই—বলে অগ্রসর হলুম।

স্ত্রীলোকটি বললে, আমি এখানকার ভাড়াটে।

এমন সময় একটি ছেলে বেরিয়ে এলো। দেখেই চিনলুম, সে হারু। হাসি মুখে বললুম, কি হারু, চিনতে পারিস্? তোর মা কোথায়?

সে আমাকে চিনলো কি-না জানিনে, কিন্তু সহাস্যে বললে, ভেতরে আসুন। মা রাঁধছে।

অগ্রসর হয়ে বললুম, তোর দিদি কোথায়? দিদি এখনি আসবে, বাইরে গেছে। আসুন না আপনি?

বেলা বারোটা বেজে গেছে, কিন্তু এ বাড়ির বাসিপাট এখনো শেষ হয়নি। দারিদ্র্যের সঙ্গে অসভ্যতা আর অশিক্ষা মিলে ঘর দুয়ারের কেমন ইতর চেহারা দাঁড়ায়, এর আগে এমন করে আর আমার চোখে পড়েনি। ছায়ামলিন দরিদ্র ঘর-দুখানার ভিজা দুর্গন্ধ নাকে এলো,—এ পাশে নর্দমা, ও পাশে কুৎসিত কলতলা। একধারে ঝাঁটা, ভাঙা হাঁড়ি, কয়লা আর পোড়া কাঠ কুটোর ভিড়! ছেঁড়া চটের থলে টাঙিয়ে পায়খানা ও কলতলার মাঝখানে একটা আবরু রক্ষার চেষ্টা হয়েছে। পিসিমাদের মতো শুদ্ধাচারিণী মহিলারা কেমন করে এই নরককুণ্ডে এসে আশ্রয় নিলেন, এ আমার কাছে একেবারে অবিশ্বাস্য, একটা বিশ্রী অস্বস্তি যেন আমার ভিতর থেকে ঠেলে উপরে উঠে এলো।

রান্নার জায়গায় এসে পিসিমাকে পেলাম। সহসা সবিস্ময়ে দেখলাম, তিনি চটাওঠা একটা কলাইয়ের বাটি মুখের কাছে নিয়ে চা পান করছেন। আমাকে দেখে বললেন, একি, নলিনাক্ষ যে? কবে এলে?

কিন্তু আমি নিমেষের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম তাঁর চা খাওয়া দেখে। পিসিমা হিন্দুঘরের নিষ্ঠাবতী বিধবা, স্নান, আহ্নিক, পূজা, গঙ্গাস্নান, দান, ধ্যান এই সব নিয়ে চিরদিন তাঁকে একটা বড় সংসারের প্রতিপালিকার আসনে দেখে এসেছি। সদ্যস্নাতা গরদের থান পরা পিসিমাকে পূজা অর্চনার পরিবেশের মধ্যে দেখে কতদিন মনে মনে প্রণাম করে এসেছি। কিন্তু তিন বছরে তাঁর একি পরিবর্তন? আমিষ রান্নাঘরে বসে ভাঙা কলাইয়ের বাটিতে চা খাচ্ছেন তিনি?

বললুম, পিসিমা, প্রণাম করবো। পা ছুঁতে দেবেন?

পা বাড়িয়ে দিয়ে পিসিমা বললেন, কলকাতায় আমরা ক' মাস হোলো

এসেছি, তোমাকে খবর দেওয়া হয়নি বটে। আর বাবা, আজকাল কে কার খবর রাখে বলো। চারিদিকে হাহাকার উঠেছে!

আমি একটু থতিয়ে বললুম, পিসিমা আপনাদের মাসোহারার টাকা আমি নিয়মিতই পাঠাচ্ছিলুম... কিন্তু আজ ছ'মাস হতে চললো আপনাদের কোনো খোঁজ খবর নেই।

খবর আর আমরা কাউকে দিইনি—নলিনাক্ষ!

পিসিমার কণ্ঠস্বর কেমন যেন ঔদাসীন্য আর অবহেলায় ভরা। একদিন আমি তাঁর অতি স্নেহের পাত্র ছিলুম, কিন্তু আজ তিনি যে আমার এখানে অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে খুশী হননি, এ তাঁর মুখ চোখ দেখেই বুঝতে পারি।

হ্যাঁগা, দিদি? বলতে বলতে সেই আগেকার স্ত্রীলোকটি হাসিমুখে চাতালের ধারে এসে দাঁড়ালো। পিসিমা মুখ তুললেন। সে পুনরায় বললে, তুমি বাজারে যাবে গা? বাজারে আজ এই এত বড় বড় টাটকা তপসে মাছ এসেছে, একেবারে ধড়ফড় করছে!

তার লালাসিক্ত রসনার দিকে তাকিয়ে পিসিমার মুখখানা কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে এলো। তিনি বললেন, তুমি এখন যাও, বিনোদবালা।

এমন উৎসাহজনক সংবাদে ঔৎসুক্য না দেখে ম্লানমুখে বিনোদবালা সেখান থেকে সরে গেল। পিসিমা বললেন, তোমার কি খুব তাড়াতাড়ি আছে নলিনাক্ষ?

বিশেষ কিছু না!—বলে আমি হাসলুম—আজকের দিনটা আপনাদের এখানে থাকবো বলেই আমি এসেছিলুম, পিসিমা।

তা বেশ ত', বেশ ত',—তবে কি জানো বাবা, খাওয়া দাওয়ার কষ্ট কিনা—বলতে বলতে পিসিমা চা খেয়ে বাটি সরিয়ে দিলেন। আমার থাকার কথায় তাঁর দিক থেকে কিছুমাত্র আনন্দ অথবা উৎসাহ দেখা গেল না।

বললুম, শোভনা কোথায় পিসিমা?

সে আসছে এখুনি, বোধ হয় ও-বাড়ি গেছে।

ঈষৎ অসন্তোষ প্রকাশ করে আমি বললুম, সে কি আজকাল একলা বাসা থেকে বেরোয়?

পিসিমা বললেন, না, তেমন কই? তবে তেলটা নুনটা, মাঝে মধ্যে দোকান থেকে আনে বৈ কি। বিনোদবালা যায় সঙ্গে।

পিসিমা তাঁর কথায় দায়িত্ব কিছু নিলেন না, কিন্তু কেমন একটা

মনোবিকারে আমার মাথা হে'ট হয়ে এলো। বললুম শোভনার ছেলেটি কোথায়? কত বড়টি হয়েছে?

পিসিমা বললেন, তার খুড়ো জ্যাঠা আমাদের কাছে ছেলেটাকে রাখলো না নলিনাক্ষ। তাদের ছেলে তারা নিয়ে গেছে।

সে কি পিসিমা, অতটুকু ছেলে মা ছেড়ে থাকতে পারবে? শোভনা পারবে থাকতে?

তা পারবে না কেন বলো? এক টাকায় দু'সের দুধও পাওয়া যায় না, ছেলেকে খাওয়াবে কি? নিজেদেরই হাঁড়ি চড়ে না কতদিন! অসুখ হলে ওষুধ নেই। শাড়ীর জোড়া বারো চোদ্দ টাকা। চা'ল পাওয়া যায় না বাজারে। আর কতদিন চোখ বুজে সহ্য করবো, নলিনাক্ষ? ভিক্ষে কি করিনি? করেছি। রাত্তিরে বেরিয়ে মান খুইয়ে হাত পেতেছি।—বলতে বলতে পিসিমা নিঃশ্বাস ফেললেন। পুনরায় বললেন, কই, কেউ আমাদের চা'ল ডালের খবর নেয়নি, নলিনাক্ষ।

অনেকটা যেন আর্তকণ্ঠে বললুম, পিসিমা, টুনুদেরও এই অবস্থা। সবাই মরতে বসেছে আজ, তাই কেউ কারো খবর নিতে পারে না। টুনুর কাছেই আপনাদের ঠিকানা পেলুম।

পিসিমা এতক্ষণ বসেছিলেন, অতটা লক্ষ্য করিনি। তিনি এবার উঠে দাঁড়াতেই তাঁর ছিন্নভিন্ন কাপড়খানার দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালুম। তিনি বললেন, এ বাড়ির ঠিকানা তুমি আর কাউকে দিয়ো না, বাবা।

এমন সময় মীনু এসে দরজার কাছে চঞ্চল হাসিমুখে দাঁড়ালো। বললে, মা, মা, শুনছ? এই নাও একটা আধুলি... হরিশবাবু দিল—।

মীনুর মাথার চুল এলোমেলো, পরনের কাপড়খানা আলুথালু। মুখখানা রাঙা, গলার আওয়াজটা উত্তেজনায় কাঁপছে। অত্যন্ত অধীর ভাবে পুনরায় সে বললে, যোগীন মাস্টার বললে কি জানো মা, আজ রাত্তিরে গেলে সেও আট আনা দিতে পারে।

পিসিমা অলক্ষ্যে আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, বেরো—বেরো হারামজাদি এখান থেকে। ঝেঁটিয়ে মুখ ভেঙে দেবো তোর।

মীনু যেন এক ফুৎকারে নিবে গেল। মায়ের মেজাজ দেখে মুখের কাছ থেকে সরে গিয়ে সে অনুযোগ করে কেবল বললে, তুমিই ত' বলেছিলে।

হারু ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠলো, ফের মিছে কথা বলছিস,

মীনু? এখন তোকে কে যেতে বলেছিল? মা তোকে রাত্তিরে যেতে বলেছিল না?

পিসিমা ব্যস্তভাবে বললেন, নলিনাক্ষ, তুমি বড্ড হঠাৎ এসে পড়েছ, বাবা। এখন ভারি আতান্তর, তুমি ঘরে গিয়ে বসো গে।

ধীরে ধীরে ঘরের ভিতরে এসে তক্তার মলিন বিছানাটার ওপর বসলুম। গলার ভিতর থেকে কি যেন একটা বারম্বার ঠেলে উঠছিল, সেটার প্রকৃত স্বরূপটা আমি কিছুতেই বোঝাতে পারবো না। আমি এই পরিবারে মানুষ, আমি এদেরই একজন, এই আত্মীয় পরিবারেই আমার জন্ম। অথচ আজ মনে হচ্ছে এখানে আমি নবাগত অপরিচিত ও অনাহূত একটা লোক। যারা আমার পিসিমা ছিল, ভগ্নি ছিল, যাদের চিরদিন আপনার জন বলে জেনে এসেছি—এরা তারা নয়, এরা বৌবাজারের বিনোদবালাদের সহবাসী, এরা সেই আগেকার সম্ভ্রান্ত পরিজনদের প্রেতমূর্তি!

মনে ছিল না জানলাটা খোলা। বৌবাজারের পথের একটা অংশ এখান থেকে চোখে পড়ে। সেখানে অসংখ্য যানবাহনের জটলা—ট্রাম, বাস, মোটর, গরুর গাড়ি আর মিলিটারী লরির চাকার আঁচড়ানির মধ্যে শোনা যাচ্ছে অগণ্য মৃত্যুপথযাত্রী দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের আর্তরব। জঞ্জালের বালতি ঘিরে বসে গেছে কাঙালীরা, পরিত্যক্ত শিশুর কঙ্কাল গোঙাচ্ছে মৃত্যুর আশায়, স্ত্রীলোকদের অনাবৃত মাতৃবক্ষ অন্তিম ক্ষুধার শেষ আবেদনের মতো পথের নালার ধারে পড়ে রয়েছে।

জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে এদিকে মুখ ফিরাবো, এমন সময় শুনি হারু আর মীনুর কান্না—পিসিমা একখানা কাঠের চেলা নিয়ে তাদের হঠাৎ প্রহার করতে আরম্ভ করেছেন। উঠে গিয়ে বলবার ইচ্ছা হোলো, তাদের কোনো অপরাধ নেই—নিরপরাধকে অপরাধী করে তোলার জন্য দিকে দিকে যে সব ষড়যন্ত্রের কারখানা তৈরী করা হয়েছে, ওরা সেই ফাঁদে পা দিয়েছে এইমাত্র। কিন্তু উঠে বাইরে যাবার আগেই বাইরে শোনা গেল, কলকণ্ঠের সম্মিলিত খলখলে হাসি। সেই হাসি নিকটতর হয়ে এলো।

ঘরের কাছাকাছি আসতেই দেখি, বিনোদবালার সঙ্গে শোভনা। আমি তাকে ডাকতেই সে যেন সহসা আঁৎকে উঠলো। দরজার কাছে এসে শোভনা শিউরে উঠে বললে, একি, ছোড়দাদা? তুমি ঠিকানা পেলে কি করে?

বললুম, এমনি এলুম সন্ধান করে। কেমন আছিস্ তোরা, শুনি।

নিজের চেহারা এতক্ষণে শোভনার নিজেরই চোখে পড়লো। জড়সড় হয়ে বললে, আমি আশা করিনি তুমি আমাদের ঠিকানা খুঁজে পাবে।

বললুম, কিন্তু আমাকে দেখে কই একটুও খুশী হলিনে ত?

শোভনা চুপ করে রইলো। পুনরায় বললুম, এতদিন বাদে তোদের সঙ্গে দেখা। কত দেশ বেড়ালুম, দিল্লীতে কেমন ছিলুম—এই সব গল্প করার জন্যেই এলুম রে। তোর ছেলেকে পাঠিয়ে দিলি, থাকতে পারবি?

না পারলে চলবে কেন ছোড়দা?

এদিক ওদিক চেয়ে আমি বললুম, কিন্তু এ-বাড়িটা তেমন ভালো নয়, তোরা এখানে আছিস কেন শোভা?

এখানে আমাদের ভাড়া লাগে না!

সবিস্ময়ে বললুম, ভাড়া লাগে না? এমন দয়ালু কে রে?

শোভনা বললে, যাঁর বাড়ি সে ভদ্রলোক আমাদের অবস্থা দেখে দয়া করে থাকতে দিয়েছেন।

আজকালকার বাজারে এমন দয়া দুর্লভ!

শোভনা বললে, তাঁর কেউ নেই, একলা থাকেন কিনা তাই—

বোধ হয় বিনোদবালা আড়াল থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল, সেই দিকে মুখ তুলে চেয়ে শোভনা সরে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে আবার সে যখন এসে দাঁড়ালো, দেখি পাতলা জালের মতন শাড়ীখানা ছেড়ে শোভনা একখানা সরুপাড় ধুতি পরে এসেছে।

বললুম, শোভনা, তোরা ঠিকানা বদলালি, আমাকে চিঠি দিতে পারতিস!

ঠিকানা ইচ্ছে করে দিইনি ছোড়দা!

কিন্তু মাসোহারার টাকা নেওয়া বন্ধ করলি কেন রে?

একটু থতিয়ে শোভনা বললে, ছেলের জন্যেই নিতুম তোমার কাছে হাত পেতে। কিন্তু ছেলে ত' নেই, ছেলে আমার নয়, তাই নেওয়া বন্ধ করেছি।

প্রশ্ন করলুম, তোদের চলছে কেমন করে?

শোভনা বললে, তুমি আজ এসেছ, আজই চলে যাবে, তুমি সে কথা শুনতে চাও কেন ছোড়দা?

চুপ করে গেলুম। একথা শোনবার অধিকার আমার নেই, খুঁচিয়ে জানবারও দরকার নেই। বললুম, নুটু কোথায়?

সে লোহার কারখানায় চাকরি করে, টাকা পঁচিশেক পায়। সপ্তাহে

সপ্তাহে কিছু চাল-ডাল আনে। আজকাল আবার নেশা করতে শিখেছে, সবদিন বাড়িও আসে না।

বললুম, সে কি, নুটু অমন চমৎকার ছেলে, সে এমন হয়েছে? হারুর পড়াশুনোও ত' বন্ধ। ও কি করে এখন?

শোভনা নতমুখে বললে, এই রাস্তার মোড়ে চায়ের দোকানে হারুর কাজ জুটেছিল, কিন্তু সে দিন কতকগুলো খাবার চুরি যাওয়ায় ওর কাজ গেছে। এখন বসেই থাকে।

স্বভাবতই এবার প্রশ্নটা এসে দাঁড়ালো শোভনার ওপর। কিন্তু আমি আড়ষ্ট হয়ে উঠলুম। কথা ঘুরিয়ে বললুম, কিন্তু একটা ব্যাপার আমার ভালো লাগেনি, শোভা। মীনুটা এখন যাই হোক একটু বড় হয়েছে, ওকে যখন তখন বাইরে যেতে দেওয়া ভালো নয়। বাড়িটায় নানা রকম লোক থাকে, বুঝিস ত।

বাইরে জুতোর মসমস শব্দ পাওয়া গেল। চেয়ে দেখলুম, আধ ময়লা জামা কাপড় পরা একটি লোক এক ঠোঙ্গা খাবার হাতে নিয়ে ভিতরে এল। মাথায় অল্প টাক, খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, লোকটির বয়স বেশি নয়। চাতালের উপর এসে দাঁড়িয়ে বললে, কই, বিনোদ কোথা গেলে? এক ঘটি জল দাও আমার ঘরে। আরে কপাল, খাবারের ঠোঙ্গা হাতে দেখলে আর রক্ষে নেই। নেড়ি কুকুরের মতন পেছনে পেছনে আসে মেয়ে পুরুষগুলো কেঁদে কেঁদে। ছোঁ মেরেই নেয় বুঝি হাত থেকে। পচা আমের খোসা নর্দমা থেকে তুলে চুষছে, দেখে এলুম গো। এই যে, এনেছ জলের ঘটি, দাও। এ-দুর্ভিক্ষে চারটি অবস্থা দেখলুম, বুঝলে বিনোদ? আগে ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে, যদি দুটি চাল পাওয়া যায়। তারপর হোলো ভাঙা কলাইয়ের থাল, যদি চারটি ভাত কোথাও মেলে। তারপর হাতে নিল হাঁড়ি, যদি একটু ফ্যান কেউ দেয়। আর এখন, কেবল কান্না,—কোথাও কিছু পায় না! আরে পাবে কোথেকে—গেরস্থরা যে ভাত গুলে ফ্যান খাচ্ছে গো। যাই দু'খানা কচুরি চিবিয়ে পড়ে থাকি।—বলতে বলতে লোকটি ভিতর দিকে চলে গেল।

আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ্য করে শোভনা বললে, উনি ছিলেন এখানকার কোন্ ইস্কুলের মাস্টার। এখন চাকরি নেই। রান্নাঘরের পাশে ওই চালাটায় থাকেন।

একলা থাকেন, না সপরিবারে?

না। ওঁর সবাই ছিল, যখন উপার্জন ছিল। তারপর বড় মেয়েটি কোথায় চলে যায়, স্ত্রী তার জন্যে আত্মহত্যা করেন। ছেলে দুটি আছে মামার বাড়ি। ছোড়দা, বলতে পারো আর কতদিন এমনি করে বাঁচতে হবে? এ যুদ্ধ কি কোনো দিন থামবে না?

উত্তর দেওয়া আমার সাধ্যের অতীত, সান্ত্বনা দেবারও কিছু ছিল না। চেয়ে দেখলুম শোভনার দিকে। চোখের নিচে তার কালো কালো দাগ, মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও বিবর্ণ, সরু সরু হাত দুখানা শির ওঠা. বস্তুহীন ও স্বাস্থ্যহীন মুখখানা। যেন যুদ্ধের দাগ তার সর্বাঙ্গে, যেন দেশ জোড়া এই দুর্ভিক্ষের অপমানজনক চিহ্ন মুখেচোখে সে মেখে রয়েছে। তার কথায় ও কণ্ঠস্বরে কেমন যেন আত্মদ্রোহিতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখতে পাচ্ছিলুম, সেদিনকার শান্ত ও চরিত্রবতী শোভনা—আমার ছোট বোন—আজ যেন অসন্তুষ্ট অগ্নিশিখার মতো লকলকে হয়ে উঠেছে। আমার কোনো সান্ত্বনা কোনো উপদেশ শোনবার জন্য সে আর প্রস্তুত নয়। কিন্তু আমার অপরিতৃপ্ত কৌতূহল আমাকে কিছুতেই চুপ করে থাকতে দিল না। এক সময়ে বললুম, শোভা, এটা ত' মানিস, সামনে আমাদের চরম পরীক্ষার দিন। চারিদিকে এই ধ্বংসের চক্রান্তের মধ্যে আমাদের টিঁকে থাকতেই হবে। যেমন করেই হোক নিজেদের মান-সম্ভ্রম বাঁচিয়ে—

মান-সম্ভ্রম?—শোভনা যেন আর্তনাদ করে উঠলো—কোথায় মান-সম্ভ্রম ছোড়দা? আগে বুকের আগুন নিয়ে ছিলুম সবাই, এবার পেটের আগুনে সবাই খাক্ হয়ে গেলুম! কে বলছে প্রাণের চেয়ে মান বড়? কোন্ মিথ্যেবাদী রটিয়েছে, আমাদের বুক ফাটে ত' মুখ ফোটে না? ছোড়দা, তুমি কি বলতে চাও, যদি তিল তিল করে না খেয়ে মরি, যদি পোড়া পেটের জ্বালায় ভগবানের দিকে মুখ খিঁচিয়ে আত্মহত্যা করি, যদি তোমার মা বোনের উপবাসী বাসি মড়া ঘর থেকে মুদ্দোফরাসে টেনে বার করে, সে দিন কি তোমাদেরই মান-সম্ভ্রম বাঁচবে? যারা আমাদেব বাঁচতে দিলে না, যারা মুখের ভাত কেড়ে নিয়ে আমাদের মারলে, যারা আমাদের বুকের রক্ত চুষে-চুষে খেলে, তাদেরই কি মান-সম্ভ্রম পৃথিবীর ভদ্রসমাজে কোথাও বাড়লো? যাও, খোঁজ নাও ছোড়দা, ঘরে ঘরে গিয়ে। কাঙ্গালীদের কথা ছাড়ো, গেরস্থ বাড়িতে ঢুকে দেখে এসো। কত মায়ের বত্রিশ নাড়ী জ্বলেপুড়ে গেল দুটি ভাতের জন্যে, কত দিদিমা পিসিমা খুড়িমা বোন বৌদিদিরা আড়ালে বসে চোখের জল ফেলছে একখানি কাপড়ের জন্যে।

অন্ধকারে গামছা আর ছেঁড়া বিছানার চাদর জড়িয়ে কত মেয়ে-পুরুষের দিন কাটছে, জানো? বাসি আমানি নুন গুলে খেয়ে কত লাজুক মেয়ে প্রাণ-ধারণ করছে, শুনেছ? মান-সম্ভ্রম! মান-সম্ভ্রম নিজের কাছেই কি রইলো কিছু ছোড়দা?

সপ্রতিভ লজ্জাবতী নিরীহ শোভনাকে এতকাল দেখে এসেছি। তার এই মুখর উত্তেজনায় আমার যেন মাথা হেঁট হয়ে এলো। আমি বললুম, কিন্তু কন্ট্রোলের দোকানে অল্পদামে চাল-কাপড় এসব পাওয়া যাচ্ছে তোমরা তার কোন সুবিধে পাও না?

শোভনা আমার মুখের দিকে একবার তাকালো। দেখতে দেখতে তার গলার ভিতর থেকে পচা ভাতের ফেনার মতো একপ্রকার রুগ্ন হাসি বমির বেগে উঠে এল। শীর্ণ মুখখানা যেন প্রবল হাসির যন্ত্রণায় সহসা ফেটে উঠলো। শোভনা হা হা হা করে হাসতে লাগলো। সে-হাসি বীভৎস, উন্মত্ত, নির্লজ্জ এবং অপমানজনকও বটে। আমার নির্বোধ কৌতূহল স্তব্ধ হয়ে গেল।

পিসিমার কাছে মার খেয়ে মীনু আর হারু এসে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল। হঠাৎ তাদের দিকে চেয়ে শোভনা চেঁচিয়ে বললে, কেন, কাঁদছিস কেন, শুনি? দূর হয়ে যা সামনে থেকে—

বিনোদবালা যেন কোথায় দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে গলা বাড়িয়ে বললে, দিদি, মাসি মেরেছে ওদের। ও-বাড়ির হরিশবাবুর কাছ থেকে মীনু পয়সা এনেছিল কিনা—হারু কি যেন বলে ফেলেছিল তাই—

শোভনার মাথায় বোধ হয় আগুন ধরে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে ঝঙ্কার দিয়ে বললে, মা! কেন তুমি ওদের মারলে শুনি?

পিসিমা কলতলার পাশ থেকে বললেন, মারবো না? কলঙ্কের কথা নিয়ে দু'জনে বলাবলি করছিল, তাই বেদম মেরেছি। বেশ করেছি।

কিন্তু ওদের মেরে কলঙ্ক ঘোচাতে তুমি পারবে?

পিসিমা চীৎকার করে উঠলেন, ভারি লম্বা লম্বা কথা হয়েছে তোর শোভা। এত গায়ের জ্বালা তোর কিসের লা? দিন রাত কেন তোর এত ফোঁসফোঁসানি? কপাল পোড়ালি তুই, মান খোয়ালি, সে কি আমার দোষ? পেটের ছেলে মেয়েকে আমি মারবো, খুন করবো, যা খুশি তাই করবো—তুই বলবার কে?

শোভনা গর্জন করে বললে, পেটের মেয়েরা যে তোমার পেটে অন্ন

যোগাচ্ছে, তার জন্যে লজ্জা নেই তোমার? মেরে মেরে মীনুটার গায়ে দাগ করলে তোমার কী আক্কেল? একেই ত' ওর ওই চেহারা, এর পর ঘব খরচ চলবে কোত্থেকে? লজ্জা নেই তোমার?

তবে আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙবো, শোভা—এই বলে পিসিমা এগিয়ে এলেন। উচ্চকণ্ঠে বললেন, নলিনাক্ষ আছে তাই চুপ করেছিলুম। বলি, ফরিদপুরের বাড়িতে বসে বিনোদবালার ঠিকানা কে জোগাড় করেছিল? গাড়িভাড়া কার কাছে নিয়েছিলি তুই?

অধিকতর উচ্চকণ্ঠে শোভনা বললে, তাহ'লে আমিও বলি। মাস্টারকে কে এনে ঢুকিয়েছিল এই বাসায়? হরিশ যোগেনদের কাছে কে পাঠিয়েছিল মীনুকে? আমাকে কেরানি বাগানের বাসায় কে পেঁ'ছে দিয়ে এসেছিল? উত্তর দাও? জবাব দাও? হোটেলের পাঁউরুটি আর হাড়ের টুকরো তুমি কুড়িয়ে আনতে বলোনি হারুকে? নুটু বাড়ি আসা ছাড়লো কার জন্যে?

মুখ সামলে কথা বলিস, শোভা।

এমন সময়ে বিনোদবালা মাঝখানে এসে দাঁড়ালো ঝগড়া মিটোবার জন্য। মারমুখী মা ও মেয়ের এই অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য অধঃপতন দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না। উঠে বাইরে এসে দাঁড়ালুম। বললুম পিসিমা, আপনি স্নান করতে যান। শোভা, তুই চুপ কর, ভাই। এরকম অবস্থার জন্যে কার দোষ দিবি বল্? তোর, আমার, পিসিমার, হারু-মীনুর, এমন কি ওই বিনোদবালা, মাস্টারমশাই, হরিশের দলেরও কোন দোষ নেই! কিন্তু অপরাধ যাদের, তারা আমাদের নাগালের বাইরে, শোভা! যাকগে, আমি এখন যাই, আবার এক সময়ে আসবো।

শোভনা কেঁদে বললে, আর তুমি এসোনা ছোড়দা!

আমি একবার হাসবার চেষ্টা করলুম। বললুম, পাগল কোথাকার!

পিসিমা বললেন, এত গোলমালে তোমার কিছু খাওয়া হোলো না বাবা, নলিনাক্ষ। কিছু মনে করো না।

বিনোদবালা বললে, চলো ঢের হয়েছে! এবার নেয়ে খেয়ে তৈরী হও দিকি? গলাবাজি করলে ত' আর পেট ভরবে না। পেটটা যাতে ভরে তার চেষ্টা করো। আমি কি আগে জানতুম তোমরা ভদ্দরলোকের ঘর. তাহ'লে এমন ঝকমারি কাজে হাত দিতুম না!

অপমানিত মুখে পলকের জন্য বিনোদবালার দিকে চোখ তুলে অগ্নি বৃষ্টি করে আমি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলুম। পাতালপুরীর সুড়ঙ্গলোকের

কদর্য কলুষ রুদ্ধশ্বাস থেকে মুক্তি নিয়ে এসে দাঁড়ালুম রাজপথের ওপর দিগন্ত জোড়া মুমূর্ষুর আর্তনাদের মধ্যে। এ বরং ভাল, এই অগণ্য ক্ষুধাতুরের কান্না চারিদিক পরিব্যাপ্ত থাকলেও কেমন একটা দয়াহীন সকরুণ ঔদাসীন্যে এদের এড়ানো চলে। কিন্তু যেখানে চিত্ত-দারিদ্র্যের অশুচিতা, যেখানে দুর্ভিক্ষপীড়িত উপবাসীর মর্মান্তিক অন্তর্দাহ, যেখানে কেবল নিরুপায় দুর্নীতির গুহার মধ্যে বসে উৎপীড়িত মানবাত্মা অবমাননার অন্ন লেহন করছে, সেই সংহত বীভৎসতার চেহারা দেখলে আতঙ্কে গলা বুজে আসে।

কিন্তু এরা কে? সেই ফরিদপুরের ছোট বাড়িটিতে ফুলের চারা আর শাকসব্জী দিয়ে ঘেরা ঘরকন্নার মধ্যেও আচারশীলা মাতৃরূপিণী পিসিমা, লাজুক একটি সদ্য-ফোটা ফুলের মতন কুমারী ভগ্নী শোভনা, চাঁপার কলির মতন নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হারু, নুটু, মীনু এরা কি সেই তা'রা? কেন একটি সুখী পরিবার ধীরে ধীরে এমন সমাজনীতি-ভ্রষ্ট হোলো? কেন তাদের মৃত্যুর আগে তাদের মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটলো এমন করে? কোন্ দয়াহীন দস্যুতা এর জন্যে দায়ী?

এই কয় মাসের মাসোহারার টাকাটা আমি অনায়াসে খরচ করতে পারি বৈ কি। অন্তত দিল্লী যাবার আগে ওদের এই অবস্থায় রেখে চুপ করে চলে যেতে পারি নে। সুতরাং অপরাহ্নকালটা নানা দোকানে ঘুরে ঘুরে কিছু কিছু খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করা গেল। শতকরা দশগুণ বেশি দামে চাল এবং পাঁচগুণ বেশি দামে আর সব খাবার জিনিসপত্র এখান ওখান থেকে কিনতে লাগলুম। কিনতে কিনতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সেটা মাত্র এই বিগত শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষ, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। স্বল্পালোক কলকাতার পথঘাট পেরিয়ে একখানা গাড়িতে জিনিসপত্র তুলে নিয়ে চললুম আবার শোভনাদের ওখানে। নিজের বদান্যতায় কোনো গৌরব বোধ করছিনে, বরং সমস্ত খাদ্য সামগ্রীগুলোকে ঘৃণ্য মনে হচ্ছে, খাদ্য আজ জীবনের সকল প্রশ্নকে ছাপিয়ে উঠেছে বলেই হয়ত খাদ্যের প্রতি এত ঘৃণা এসেছে। এসব পদার্থ আগে ছিল ভদ্রজীবনের নিচের তলাকার লুকানো আশ্রয়ে, সেটার কোনো আভিজাত্য ছিল না—আজ সেটা যেন মাথার ওপর চড়ে বসে আপন জাতিচ্যুতির আক্রোশটা সকলের উপর মিটিয়ে নিচ্ছে!

তবু দুর্গম পথঘাট পেরিয়ে সেগুলো নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলুম বৌবাজারের বাড়ির দরজায়। বহু পরিশ্রম আর অধ্যবসায় ব্যয় করে দু-তিন জন লোকের সাহায্যে সেগুলো নিয়ে গিয়ে রাখলুম সেই সরু আনাগোনার পথের এক ধারে। মাস তিনেকের মত খাদ্যসম্ভার কিনে এনেছিলুম। জিনিসপত্র বুঝে নিয়ে লোকগুলোকে বিদায় করলুম।

ভিতর দিকে কোথায় যেন একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলছিল, তারই একটা আভা এসে পড়েছিল আমার গায়ে। কলতলার ওপাশ থেকে শোনা গেল, নারীকণ্ঠের সঙ্গে ইস্কুলমাস্টারের কথালাপের আওয়াজ জড়ানো। তাছাড়া নিচের তলাটা নিঃসাড় মৃত্যুপুরীর মতো।

আমি কয়েক পা অগ্রসর হয়ে গেলুম। ডাকলুম, মীনু! হারু!

কোনো সাড়া নেই। যে ঘরখানায় দুপুরবেলায় আমি বসেছিলুম, সে ঘরখানা ভিতর থেকে বন্ধ। বুঝতে পারা গেল, ক্লান্ত হয়ে পিসিমারা সবাই ঘুমিয়েছে। আবার আমি ডাকলুম, মীনু, ও মীনু!

বোধকরি বাইরের থেকে আমার গলার আওয়াজটা ঠিক বোধগম্য হয়নি, ঘরের ভিতর থেকে শোভনা সাড়া দিয়ে বললে, দিনবাত এত আনাগোনা কেন গা তোমার? মীনু ও বাড়িতে গেছে, আজ তাকে পাবে না, যাও হতভাগা, চামার!

আমি বললুম, শোভা, আমি রে, আর কেউ নয়, আমি—ছোড়দা। দরজাটা খোল দেখি?

ছোড়দা?—শোভনা তৎক্ষণাৎ দরজাটা খুলে দিয়ে আমার পায়ের কাছে এসে বসে পড়লো। অশ্রুসজল কণ্ঠে বললে, ছোড়দা পেটের জ্বালায় আমরা নরককুণ্ডে নেমে এসেছি! তুমি আমাকে মাপ করো, তোমার গলা আমি চিনতে পারিনি।

শোভনার হাত ধরে আমি তুললুম। বললাম, কাঁদিসনে, চুপ কর। তোরা ত' একা নয় ভাই, লক্ষ লক্ষ পরিবার এমনি করে মরতে বসেছে। কিন্তু ভেঙে পড়লে চলবে না, এমনি করেই এই অবস্থাকে পেরিয়ে যেতে হবে, শোভা। শোন, কালকেই আমি দিল্লী যাবো, তাই তাড়াতাড়িতে তোদের জন্যে চারটি চাল-ডাল কিনে আনলুম, ওগুলো তুলে রাখ্।

চাল-ডাল এনেছ? দুর্বল শরীরের উত্তেজনায় শোভনা যেন শিউরে উঠলো। যেন ভারী ক্ষুধাতৃপ্তির কল্পনায় কেমন একটা বিকৃত উগ্র ও অসহ্য উল্লাস তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে কাঁপতে লাগলো। রুদ্ধশ্বাসে সে বললে,

তুমি বাঁচালে—তুমি বাঁচালে, ছোড়দা! তোমার দেনা আমরা কোনদিন শোধ করতে পারবো না! এই বলে আমার বুকের মধ্যে মাথা রেখে আমার চিরদিনকার আদরের ভগ্নী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

বললাম, ওর সঙ্গে নতুন জামা কাপড়ের একটা পুঁটলি রয়েছে, ওটা আগে তুলে রাখ, শোভা।

শোভনা আমাকে ছেড়ে দিয়ে কেরোসিনের ডিবেটা নিয়ে এসে খাদ্য সামগ্রীর কাছে দাঁড়িয়ে একবার সব দেখলো। তারপর অসীম তৃপ্তির সঙ্গে কাপড়ের বস্তাটা তুলে নিয়ে ঘরের ভিতরে চৌকির নিচে রেখে এলো। বললে, ছোড়দা, মনে আছে, কোরা জামা-কাপড় পরে লোকের সামনে এসে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে কী লজ্জার কথা ছিল? দোকান থেকে চাল-ডাল এলে লুকিয়ে সেগুলোকে সরিয়ে ফেলতুম—পাছে কেউ ভাবে, চাল কেনার আগে আমাদের বুঝি খাবার কিছু ছিল না! মনে আছে ছোড়দা?

হেসে বললাম, সব মনে আছে রে!

শোভনা করুণকণ্ঠে বললে, তুমি বলতে পারো ছোড়দা, এ দুর্ভিক্ষ কবে শেষ হবে? সবাই যে বলছে, নতুন ধান উঠলে আমাদের আর উপোস করতে হবে না?

তার আর্তকণ্ঠ শুনে আমি চুপ করে রইলুম। কারণ, সরকারী চাকর হলেও ভিতরের খবর আমার কিছুই জানা ছিল না। শোভনা পুনরায় বললে, ফরিদপুরের সেই মস্ত মাঠ তোমার মনে আছে, ছোড়দা? ভাবো ত. সেই মাঠে আমনের সোনার শীষ পেকেছে, হাওয়ায় তারা ঢেউ খেলছে আনন্দে, মাঠে মাঠে চাষার দল গান গেয়ে গেয়ে কাটছে সেই ধান,—সেই লক্ষ্মীকে ভারে ভারে তারা ঘরে তুলে আনছে! মনে পড়ে?

শোভনার স্বপ্নময় দুটি চোখ হয়ত সেই সোনার বাঙলার মাঠে মাঠে একবার ঘুরে এলো, কিন্তু আমি কেরোসিন ডিবের আলোয় এই নরকুণ্ড ছাড়া আর কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না। কেবল নিঃশ্বাস ফেলে বললুম, মনে পড়ে বৈকি।

কিন্তু একি শুনছি ছোড়দা? শোভনা আমার মুখের দিকে আবার ফিরে তাকালো। সভয় চক্ষু তুলে সে পুনরায় বললে, গোছা গোছা কাগজ বিলিয়ে আবার নাকি ওরা শুষে নিয়ে যাবে সেই আমাদের ভাঙা বুকের রক্ত? নবান্নর পর আবার নাকি ভরে যাবে আমাদের ঘর কাঙালীর কান্নায়? বলতে পারো, তুমি?

কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলুম, সহসা বাইরে কার পায়ের শব্দ পেয়ে শোভনা সচকিত আতঙ্কে অন্ধকারের দিকে ফিরে তাকালো। তারপর কম্পিত অধীর কণ্ঠে সে বললে, ছোড়দা, এবার তুমি যাও, তোমার অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন নিশ্চয় ন'টা—আমার মনে ছিল না, নিশ্চয় ন'টা বেজেছে। এবার তুমি যাও ছোড়দা।

এগুলো তুলে রাখ্‌ আগে সবাই মিলে?

রাখবো, ঠিক রাখবো—একটি একটি চাল-ডালের দানা গুনে গুনে রাখবো—কিন্তু এবার তুমি যাও, ছোড়দা। আলো ধরছি.. তুমি যাও, একটুও দেরি করো না…লক্ষ্মীটি ছোড়দা…

শোভনা চঞ্চল অস্থির উদ্দাম হয়ে এসে আমাকে যখন একপ্রকার টেনে নিয়ে যাবে, সেই সময় একটি লোক চাল-ডালের বস্তার ওপর হোঁচট খেয়ে ভিতরে এসে দাঁড়ালো। একেবারে গায়ের উপর এসে পড়ে বললে, ওঃ, নতুন লোক দেখছি। চাল-ডাল এনে একেবারে নগদ কারবার।

লোকটার পরনে একটা খাকি শার্ট, সর্বাঙ্গে কেমন একটা নেশার দুর্গন্ধ। আমি বললুম, কে তুমি?

আমি কারখানার ভূত সার। এই বলে হঠাৎ শোভনার একটা হাত ধরে ঘরের দিকে টেনে নিয়ে বললে, এসো, কথা আছে।

কথা কিছু নেই, ছাড়ো। বলে শোভনা তার হাতখানা ছাড়িয়ে নিল।

বটে!—লোকটি ভুরু বাঁকিয়ে বললে, আগাম একটা টাকা দিইনি কাল?

রুদ্ধশ্বাসে শোভনা বললে, বেরিয়ে যাও বলছি ঘর থেকে।

বাঃ—বেরিয়ে যাবো বলে বুঝি এলুম দেড় মাইল হেঁটে? বেশ কথা বলে পাগলি!

চীৎকার করে শোভনা বললে, বেরোও বলছি শিগগির। চলে যাও—দূর হয়ে যাও ঘর থেকে—

লোকটা বোধ হয় তক্তাখানার ওপর বসবার চেষ্টা করছিল। হেসে বললে, আজ বুঝি আবার খেয়াল উঠলো?

শোভনা আর্তনাদ করে উঠলো ছোড়দা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছ তুমি? এ অপমানের কি কোনো প্রতিকার নেই?…দাঁড়াও, আজ খুন করবো—বঁটিখানা…

বলতে বলতে ছুটে সে বেরুলো—রান্নাঘরের দিকে চললো। লোকটা এবার উঠে বাইরে এলো। বললে, মশাই, এই নিয়ে মেয়েটা আমাকে

অনেকবারই খুন করতে এলো, বুঝলেন? আসলে মেয়েটা মন্দ নয়, কিন্তু ভারি খেয়ালী! তবে কি জানেন সার, আমরা হচ্ছি 'এসেনশিয়াল্ সার্ভিসের' লোক, যুদ্ধের কারখানায় লোহা লক্কর নিয়ে কাজ করি, মেয়েমানুষের মেজাজ-টেজাজ অত বুঝিনে! এসব জানে ওই 'আই-ই' মার্কা লোকগুলো, ওরা নানা রকম ভাঁড়ামি করতে পারে!

এমন সময় উন্মাদিনীর মতন একখানা বঁটি হাতে নিয়ে শোভনা ছুটে বেরিয়ে এলো। পিসিমা ধড়মড়িয়ে এলেন, হারু ছুটে এলো। লোকটি শান্তকণ্ঠে বললে, আচ্ছা, আচ্ছা, আর খুন করতে হবে না, দেখছি আজ খেয়ালের ভূত চেপেছে ঘাড়ে। আচ্ছা—এই যাচ্ছি সরে।

বিনোদবালা আর পিসিমা দৌড়ে এসে ধরে ফেললেন শোভনাকে।

লোকটি পুনরায় নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বললে, বেশ, সেই—ভালো। বিনোদের ঘরে রইলুম এ রাত্তিরটার মতন। কিন্তু মাঝরাত্তিরে আমাকে নিশ্চয় ডেকে ঘরে নিয়ো, নৈলে কিছুতেই আমার ঘুম হবে না, বলে রাখলুম। আচ্ছা, বেশ, কাল না হয় আড়াই সের চালই দেওয়া যাবে। আয় বিনোদ, তোর ঘরে যাই। বলতে বলতে বিনোদের হাতখানা টেনে নিয়ে সেই কদাকার লোকটা ইস্কুলমাস্টারের ঘরের দিকে চলে গেল।

শোভনা সহসা আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো। বললে, কবে, কবে ছোড়দা, কবে এই রাক্ষুসে যুদ্ধ থামবে, তুমি বলে যাও। তুমি বলে যাও, কবে এই অপমানের শেষ হবে, আমাদের মৃত্যুর আর কত দিন বাকি?

আস্তে আস্তে আমি পা ছাড়িয়ে নিলুম। শোভনার হৃৎপিণ্ড থেকে আবার রক্ত উঠে এলো। বললে, তুমি যেখানে যাচ্ছ, সেখানে যদি কেউ মানুষ থাকে, তাদের বলো এ যুদ্ধ আমরা বাধাইনি, দুর্ভিক্ষ আমরা আনিনি, আমরা পাপ করিনি, আমরা মরতে চাইনি...

শোভনা কাঁদুক, সবাই কাঁদুক। আমি অসাড় ও অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা বাইরে এসে পথে নামলুম। অন্ধকারে কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না। শুধু অন্ধকার, অনন্ত অন্ধকার। কেবল মনে হোলো, অঙ্গারের আগুন যেমন পুড়ে পুড়ে নিস্তেজ হয়ে আসে, তেমনি মহানগরের ক্ষুধাগ্রস্ত কাঙালীরা চারিদিকে চোখ বুজে পথে ঘাটে নালা নর্দমায় শুয়ে মৃত্যুর পদধ্বনি কান পেতে শুনছে!

ভিড়

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টেশনে আসতে দেরি হয়ে গিয়েছে, টিকিট-ঘরের দিকে চেয়ে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হবার উপক্রম হল। তিনবার কুণ্ডলী খেয়ে এক বিরাট কিউ জানালা থেকে এনকোয়্যারি অফিস পর্যন্ত দাঁড়িয়ে। ঘড়ির দিকে অসহায়-ভাবে তাকিয়ে সর্বাগ্রে চট করে সেই কুণ্ডলী-পাকানো অজগর সাপের লেজের আগায় গিয়ে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলাম। নইলে আরও পিছিয়ে পড়তে হবে এক্ষুনি।

তিন মিনিটের মধ্যে লেজটা আরও ছ' হাত বেড়ে গেল।

বহুলোক ব্যাপার দেখে টিকিটের জানলার কাছাকাছি যে সব লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘর্মাক্ত কলেবরে, তাদের কাছে টাকা নিয়ে গিয়ে খোশামোদ করছে, মশাই, আপনি তো টিকিট করছেনই, এই উলুবেড়ের দু'খানা অমনই ওই সঙ্গে—

আমার মশাই, একখানা অমনই কোলাঘাটের—

যাকে অনুনয় করা হচ্ছে, সে বলছে, ওসব হবে না। নিজের নিয়েই ব্যস্ত, না, না, কেন আপনি বকছেন মশাই? যান, তার চেয়ে কিউতে দাঁড়ানো ভাল। লোককে খোশামোদ করা ধাতে সয় না। কিন্তু এদিকে ঘড়িতে এগারোটা বাজে। এগারোটা কুড়িতে নাগপুর প্যাসেঞ্জার ছাড়বে—কুড়ি মিনিটের মধ্যে। সম্মুখের এই বিরাট কিউ। বিশ্বাস তো হয় না।

আরও দশ মিনিট কেটে গেল। কিউ যেমন তেমনই, বিশেষ কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন অন্তত চর্মচক্ষে তো দৃষ্টিগোচর হয় না, এক-একখানা টিকিট দিতে ছ' মাস লাগছে। এই রেটে আমার পালা আসতে বেলা আড়াইটে বাজবে, এগারোটা কুড়িতে এর সিকির সিকিও ফুরোবে না।

সঙ্গে লটবহর, মেয়েছেলে। নইলে না হয় ফিরেই যেতাম। সারাদিনে আর ট্রেনও নেই।

এই সব ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ হুড়মুড় করে গেল কিউ ভেঙে। দেখি, জনতা ঊর্ধ্বশ্বাসে পাশের জানালার দিকে ছুটছে। কি ব্যাপার, কেউ বলে না। চেয়ে দেখি, এ জানলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ছুটলাম পাশের

জানলার দিকে। সেখানে তখন ঠেসাঠেসি, ধাক্কাধাক্কি, হাতাহাতি চলছে। পূর্বতন কিউয়ের লেজের দিকে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারাই এখন নতুন কিউয়ের পুরোভাগে আসবার প্রয়াসী।

একজন বলছে, তুমার জায়গা এখানে ছিল? খবরদার—

খবরদার।

মু সাম্ভালকে বাত বোলো—

এই ব্যাটা, দেখবি?

মুহূর্তমধ্যে বিশৃঙ্খলা, কিলোকিলি। অকথ্য ভাষণের বন্যা বয়ে গেল উভয় পক্ষে।

আমি অতি কষ্টে প্রাণপণে জন আষ্টেক লোকের পেছনে জায়গা দখল করেছিলাম। মিনিট দশেক পরে যখন টিকিটের জানলার কাছে আসবার পালা এল, তখন আমার গন্তব্য স্থানের কথা শুনেই মেমসাহেব বললে, নট হিয়ার, নম্বর টোয়েন্টি।

সে আবার কোথায়? নাঃ, ট্রেন পাওয়া যাবে না দেখছি। আর সময় নেই। যদি বা অতি কষ্টে একটু জায়গা করলাম, তাও কোনও কাজে এল না। খুঁজে খুঁজে কুড়ি নম্বরের জানলা বার করলাম, সেখানেও কিউ, তবে তত লম্বা নয়। একজন বললে, মশাই, কোথায় যাবেন? আমায় দয়া করে একখানা খড়কপুরের—

মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছে। রূঢ়স্বরে বললাম, কেন বিরক্ত কর বাপু?

মেমসাহেবকে নোট বার করে দিতেই ছুঁড়ে ফেলে দিলে, নো চেঞ্জ, ভাগো।

তটস্থ ও কাঁচুমাচু হয়ে বলি, ইয়েস ম্যাডাম, সরি ম্যাডাম, হিয়ার মাই চেঞ্জ ম্যাডাম।

পকেট হাতড়ে দশ আনা পয়সা বার করবার পথ খুঁজে পাই না।

কনুইয়ের কাছে একটি সানুনয় অনুরোধ—আমায় বাবু, একখানা মেচেদার টিকিট যদি ক'রে দেন, ছোট ছেলে সঙ্গে রয়েছে, ভিড়ে ঢুকতে পারছি না, দু'বার গেনু—

মাথার তখন সম্পূর্ণ বেঠিক। বলি, ভাগো।

বাবু, দেন একখানা। দু'বার গেনু—

নেই হোগা, ভাগো।—রাগের মাথায় হিন্দি বেরিয়ে পড়ে।

টিকিট-কাটা পর্ব সাঙ্গ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটি গাড়ি ধরতে। মেয়েদের

গাড়িতে জিনিসপত্র তুলে দিলাম, কারণ চেয়ে দেখে মনে হল, অতি কষ্টে নিজে উঠতে পারব কি না সন্দেহ।

অসম্ভব ভিড় প্রত্যেক গাড়িতে। তার ওপর মানুষে কেমন যেন হৃদয়হীন, রূঢ়, পশুবৎ হয়ে উঠেছে, এরা নিজের নিজের জিনিস, নিজের নিজের বসবার জায়গা সামলাতে ভীষণ ব্যস্ত ও অত্যধিক সতর্ক। এই রেলেই কতবার আগে ভ্রমণ করেছি, মানুষের মধ্যে কত সহানুভূতি, কত মমত্ব দেখেছি। এখন এই বিপদের চাপে মানুষ রূঢ় কঠোর হয়ে উঠছে। একবার মনে আছে, সম্পূর্ণ অপরিচিতা এক ভদ্রমহিলা আমাকে তাঁদের খাবার-ঝুড়ি থেকে খাবার বের ক'রে ডিশে সাজিয়ে তাঁর স্বামীর হাত দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। ভদ্রলোক আমার সামনে ডিশ রেখে বিনীত-ভাবে বললেন, একটু জলযোগ করুন।

আমি চমকে উঠলাম। হাওড়া থেকে একসঙ্গে ইণ্টার ক্লাসে যাচ্ছি পাশাপাশি বেঞ্চিতে, অথচ একটা কথা বিনিময় হয়নি তাঁদের সঙ্গে আমার। জলখাবার দেওয়ার ব্যাপার ঘটল পরদিন সকালে কিউল স্টেশনে।

সংকোচের সঙ্গে বললাম, না, না, এ কেন, আমি—আপনারা খান।

না, সে শুনব না, খেতেই হবে। এ সব স্টেশনে খাবার পাওয়া যায় না, অনেক খাবার আছে আমাদের সঙ্গে, দয়া করে একটু মুখে দিন।

কোথায় গেল সে সব দিন! এখন একখানা কচুরির মত তিন ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট পুরির দাম এক আনা। মানুষের ভ্রাতৃভাব কোথায় উবে গিয়েছে।

ট্রেনের জানলার বাইরে ভিখারীর ভিড়। একজন শীর্ণকায় স্ত্রীলোক. কোলে তার একটি ছেলে, ইনিয়ে বিনিয়ে বলছে, বাবু, তোমরা থাকতে আমরা ডুবে যাব! সমস্ত দিন খাইনি, দুটো পয়সা দেন।

একজন উত্তর দিলে, কোথা থেকে দোব বাপু! চল্লিশ টাকা চালের মণ, এবার সবাই ডুববে, যাও, হবে না।

একটি রোগা হ্যাংলা গোছের লোক ময়লা পইতে বার করে ভিক্ষে করছে। কামরার ও-প্রান্ত থেকে সে সুর করে প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করতে করতে আসছে শুনছি। তার নাকি অনেক কষ্ট, বাড়িতে বৃদ্ধা মাতা শয্যাগত, স্ত্রী-পুত্র অনাহারে মরছে। যত কাছে আসে, ততই দেখলাম, নিজের মনে রাগ ও বিরক্তি জমে উঠছে। কাছে এলে মুখ খিঁচিয়ে বলি, ইদিকে আর

কোথায় আসছ? দেখছ ভিড়ের ঠ্যালা! না, পাব কোথাও খুচরো যে তোমায় দোব! খুচরোর অভাবে বলে চা খেতে পাইনি—

গাড়ির ভিড় ক্রমশই বাড়ছে বলে সবাই গাড়ির দোর ঠেলে বন্ধ করে রেখেছে, কাউকে উঠতে দেবে না। জানলা গলিয়ে জোর-জবরদস্তি করে লোক উঠে পড়ে দফায় দফায় মারামারির সৃষ্টি করছে।

মশাই, একটু সরে বসুন না!

কোথায় সরে বসব, দেখুন। বাঃ, ঘাড়ে এসে বসলেন যে!

আপনি যে এতটা জায়গা জুড়ে বসে থাকবেন! দেখছেন না ভিড়!

তাই বলে আপনি ঘাড়ের ওপর এসে বসবেন? খুব ভদ্দরলোক তো?

ভদ্দরলোক তুলে কথা বলবেন না, সাবধান করে দিচ্ছি।

ওঃ, কেন? নবাব খানজা খাঁ নাকি? কিসের ভয়? তোমার এক-চালায় বাস করি?

খবরদার! মুখ সামলে। 'তুমি' 'তুমি' করবে না বলছি, একটি চড়ে—

অতঃপর বিরাট কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি। এক পক্ষে ভাঙা ছাতা, অপর পক্ষে মুষ্টিবদ্ধ হস্ত। গাড়ির লোকে 'হাঁ' 'হাঁ' করে উভয়ের মধ্যে এসে পড়ে তাদের ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। চলল নানাবিধ সদুপদেশ।—এই সামান্যক্ষণ গাড়িতে থাকা, তার জন্যে কেন ঝগড়া করা? বলি, এই আঁদুল থেকেই তো লোক নামতে সুরু হবে।

গাড়ি চলেছে। কলকারখানা, লোকের ঘরবাড়ি, ধানের ক্ষেত। প্রত্যেক স্টেশনে লোকে কামরার বাইরের হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলছে, প্রায়ই নাকি দু-একটা পড়ে গিয়ে মারাও যাচ্ছে। নতুন নতুন স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে কি ভীষণ ভিড়, এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত লোকজন, মেয়েছেলে, ট্রাংক, বোঁচকা, পুঁটুলি, গুড়ের ভাঁড়, চোরাই চালের বস্তা, ছাতি, লাঠি নিয়ে অধীর ব্যস্ততার সঙ্গে ছুটোছুটি করছে, যে করে হোক গাড়িতে উঠতেই হবে তাদের।

আমাদের কামরায় যত লোক বসে আছে, তার দুগুণ দাঁড়িয়ে রয়েছে। যারা ঢুকতে আসছে, তাদের সকলকেই বলা হচ্ছে, আগে যাও, আগের গাড়ি খালি।

সে স্তোকবাক্যে কেউ ভুলে আগে দেখতে যাচ্ছে, কেউ না ভুলে বলছে, কোথায় খালি বাবু, দেখে আসুন। পিঁপড়ে ঢোকানোর জায়গা নেই কোনও গাড়িতে, দেন একটু খুলে, দিনেরাতে এই একখানা গাড়ি।

এক দাড়িওয়ালা শিখ আমাদের দ্বারপাল। সে হুংকার দিয়ে বলছে, আগাড়িওয়ালা ডাব্‌বামে চলা যাও।

ইতিমধ্যে ওপরের তাক থেকে এক লুঙি-পরা গোঁপছাঁটা মুসলমান পা দুলিয়ে নিচের বেঞ্চিতে নামবার চেষ্টা করলে দু-একবার, ভিড়ের জন্যে কৃতকার্য হল না, শেষ পর্যন্ত একজনের প্রায় ঘাড়ে পা দিয়েই নামল। লম্বা, রোগামত লোকটা, মুখখানাতে যেন বদমাইসি মাখানো। ওকে দেখে আজকের এই সমস্ত কলহ-কোলাহল-নির্মমতার প্রতীক বলে যেন মনে হল। বিড়ির ধোঁয়ায় চারিদিকে অন্ধকার করে দিয়ে দিব্যি সে চেপে বসল সামনের বেঞ্চিতে।

কামরার মধ্যে অন্য কোন কথা নেই, কেবল—

মশাই, আপনাদের ইদিকে চাল কি দর?

চল্লিশ টাকা। আপনাদের?

আমাদের সাড়ে বত্রিশ দেখে এসেছি।

সে কোন্ জায়গা?

ওই দক্ষিণে—ডায়মণ্ডহারবার।

মানুষ এবার না খেয়ে মরে যাবে মশাই।

ডায়মণ্ডহারবারবাসী লোকটি বললে, মরে যাবে কি মশাই, মরে যাচ্ছে। আমাদের ওদিকে একদিন কতকগুলো গরিব লোকের মেয়েছেলে এসে বললে, তোমাদের বনের কচু সব তুলে নিয়ে যাব, আর কাঁচ জামরুলপাতা।

কে একজন জিগ্‌গেস করলে, জামরুলপাতা আবার খায় নাকি?

খায় না? গিয়ে দেখুন, আমাদের দেশে জামরুল গাছে আর পাতা নেই, সব সাবাড় করেছে।

আর একজন বললে, এই তো আজও দুটো ভিখিরি শেয়ালদার কাছে ফুটপাথে মরে পড়ে ছিল সকালবেলা।

আজ নতুন দেখলেন আপনি? ও দুটো-পাঁচটা রোজ মরছে। কাল বৈঠকখানার বাজারে কন্ট্রোলের চালের কিউতে এক বুড়ী ধুঁকতে ধুঁকতে মারা গেল। আমাদের দোকানের সামনে।

কিসের দোকান আপনাদের?

কাপড়কাচা সাবান। আমি এই ইস্টিশানে নামব, পুঁটুলিটা ছেড়ে দেন।—চিঁড়ে, তাই দু'টাকা সের।

মনে পড়ল, আমাদের দেশের হাটে সদগোপ মেয়েরা চিঁড়ে বিক্রি

করত, দু' আনা সের, চিরকাল দেখে এসেছি। চার আনা সেরের মুড়কি, খুব ভাল মুড়কি ছিল। আর সে সব দিন ফিরবে কখনও?

কি একটা স্টেশনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। শিখ দাঁড়িয়ে উঠল, দরজা ঠেলে বন্ধ করে যাত্রীদের রুখতে হবে। আবার একদফা হৈ-হৈ চীৎকার, গালাগালি, অনুনয়-বিনয় ও হুংকারের পালা সুরু হল। একটা কচি ছেলের চীৎকার প্ল্যাটফর্মের বাইরে। একজন লোক জানলা দিয়ে গলে আসবার প্রাণপণ চেষ্টা করাতে গাড়ির লোকে তাকে ধাক্কা মেরে নামিয়ে দিয়ে জানলা বন্ধ করে দিলে। মনে হল, বেশ হয়েছে, ওঠ জানলা দিয়ে!

মন নিষ্ঠুর নির্মম হয়ে উঠেছে বিপদের মুখে পড়ে। অন্য কারও সুবিধা-অসুবিধা সে এখন বুঝতে রাজি নয়।

একটা স্টেশনে দেখা গেল, চারিদিকে থৈ-থৈ করছে জল। বললাম, এটা কি বন্যে নাকি?

একজন বললে, কাঁসাই নদীর বন্যে। কত ধান যে ডুবে গিয়েছে, দু'খানা গাঁ একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে মশাই।

শিখ দ্বারপাল বললে, নেই হোগা, আগাড়িওয়ালা ডাব্‌বা একদম খালি, যাও আগাড়ি।

আর একজন বললে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না মশাই? চেতাবুনিতে যে লিখেছিল—

কোণ থেকে কে বলে উঠল, বাদ দিন চেতাবুনি! জোচ্চোর কোথাকার—

অর্থাৎ লোকটা চেতাবনিতে কথিত প্রলয় দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়েছে।

এইবার সেই লুঙি-পরা লোকটি নড়ে চড়ে বসে বললে, বাবু, আমাদের নন্দিগ্রাম থানায় এমন এক জ্বর দেখা দিয়েছে, যার হচ্ছে, তিন দিন চার দিন পরে মারা পড়ছে। আর বছর হল আশ্বিনে ঝড়, এ বছর বন্যে আর তার সঙ্গে এই জ্বর। আমার মশাই বাইশ বছরের ছেলে—

বলেই, কোথাও কিছু নেই, লোকটা হাউহাউ করে কেঁদে উঠল।

কি হয়েছে ছেলের?

আর কি হবে বাবু, নেই। সেই খবর পেয়েই তো দেশে যাচ্ছি। কলকাতায় কলে চাকরি করি, আর বছর ঘরদোর ঝড়ে সব পড়ে গেল, আবার এ বছর বাইশ বছরের ছেলেটা—

আবার সে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। গাড়িসুদ্ধ লোকের গোলমাল যেন মন্ত্রবলে স্তব্ধ হয়ে গেল। শিখ দ্বারপাল তার হুংকার থামিয়েছে। কাছাকাছি দু-একজন লোকা সান্ত্বনা দেবার কথা বলতে লাগল। কি অসহায় ওর কান্না!

কেঁদো না ভাই, কি করবে কেঁদে, আহা, বাইশ বছরের ছেলে! বাঁচা-মরা কারও হাতে নয় দাদা। নাও, বিড়িটা ধরাও।

ওই একটি পুত্রবিয়োগাতুর পিতার ক্রন্দনে গাড়ির আবহাওয়া যেন বদলে গেল একমুহূর্তে। সূচ্যগ্রপরিমাণ স্থানের জন্যে যে নির্লজ্জ চেষ্টা ও আঁকড়ে থাকবার আগ্রহ, তা বন্ধ হয়ে গেল।

সরে আসুন না, এদিকে জায়গা আছে।

একটা ছোট ছেলে অনেকক্ষণ থেকে একটা নারকেল তেলের বোতল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, এতক্ষণ পরে একজন কে তাকে হাত ধরে বললে, বাবা এখানে বস কোনও রকমে, হয়ে যাবে এখন।

যে লুঙি-পরা লোকটিকে এতক্ষণ আমি গুণ্ডার সর্দার বলে ভাবছিলাম, তার মুখের দিকে চেয়ে এমন একটা করুণা ও সহানুভূতির উদ্রেক হল। হতভাগ্য পিতা, হয়তো ওর বৃদ্ধ বয়সের সম্বল হয়ে দাঁড়াত এই পুত্রটি, হয়তো ওর একমাত্র পুত্র। গাড়ির আবহাওয়া ওর কান্নার সুরে কি আশ্চর্য-ভাবেই বদলে গিয়েছে। এই নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা, উগ্র স্বার্থবোধ, যা হাওড়া থেকে উঠে পর্যন্ত সমানে দেখে আসছি, যাতে শুধু মানুষের পশুত্বের ছবিটাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল চোখের সামনে, ওই লুঙি-পরা লোকটির চোখের জলে সব যেন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। মানুষের লজ্জা হল মানবতার অপমানে যেন। যেন সবাই সতর্ক হয়ে উঠল।

এইবার যে স্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়াল, সেখানে লোকটি নেমে যাবে। গাড়ির এক কোণে একটি দাঁড়িওয়ালা বৃদ্ধ বসে ছিল, সে আবেগভরে বললে, এখানে নামবে? আচ্ছা বাবা, ভগবান তোমায় মনে শান্তি দিন, আমি বুড়ো বামুন, আশীর্বাদ করছি, ভাল হবে তোমার, ভাল হবে।

বীরুর প্রশ্ন

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বীরু আসিয়া উপস্থিত হইল।

চুল উস্কখুস্ক, মুখ আর বস্ত্রের দিকে চাহিয়া মনে হয় বহুদিনই ধোপা-নাপিতের সঙ্গে উহার সাক্ষাৎ নাই। পাও খালি। ফিটফাট কোন কালেই থাকে না, তবুও আজ যেন অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম—"একি, কেউ মারা গেছে নাকি?"

প্রশ্নটা মুখ দিয়া বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পারিলাম, ভুল হইয়া গিয়াছে,—শোকের বেশ নয়, গায়ে জামা রহিয়াছে। বীরু উত্তর করিল—"কেউ বেঁচে নেই।"

ওর উত্তর এইরকম হেঁয়ালি গোছেরই হয়। কোন পারিবারিক বিয়োগ নয় বলিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া হেঁয়ালির অন্তর্নিহিত অর্থটা বাহির করিবার চেষ্টা করিলাম একটু। মাথায় আসিল না। বলিলাম, "অনেকদিন পরে এসেছিস। আমি তোর বাসাতেও গিয়েছিলাম; একবার তো কোন খবরই যোগাড় করতে পারলাম না। দ্বিতীয়বার গিয়ে শুনলাম ও বাসায় আর নেই তুই, কোথায় উঠে গেছিস। তা কোথায় গেছিস?"

"চৌরঙ্গী অঞ্চলে।"

আবার হেঁয়ালি। বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম—"চৌরঙ্গী অঞ্চলে!"

বীরু উত্তর করিল—"কতকগুলো সঙ্গী পেয়ে গেলাম, একসঙ্গে আছি। একটা সিগারেট দে দিকিন, আর এক গ্লাস জল।"

বলিলাম—"কিছু খাবি?...তোর মুখটা বড় যেন শুকনো বোধ হচ্ছে।"

বীরু এক ধরনের কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিল—"এবার তুই হাসালি। মুখ শুকনো বলেই খেতে হবে? বাঙালী মরতে বসলেও যে তার খাবার দরকার হচ্ছে না। আমায় কী মনে করলি তুই?"

উত্তর যাহা দিলাম সেটা আক্রোশের বশে দিলাম কতকটা।—আমি বিদ্যাটাকে বুদ্ধির বলে খাটাইয়া তেতলায় গদিআঁটা কোচে বসিয়া পাঁচতলার স্বপ্ন দেখিতেছি আর আমার চেয়ে বেশি বিদ্যা থাকা সত্ত্বেও ও বুদ্ধির অভাবে—অর্থাৎ দেশ-দেশ ও জাতি-জাতি করিয়া আজ এই দশায় উপস্থিত।

অবশ্য আক্রোশের কারণ এ নয়, কারণটা এই যে, এত নিচে থাকিয়াও ও একেবারেই কিছু না বলিয়াও আমায় যেন নিজের অনেক নিচে করিয়া রাখিয়াছে। কথাটা সত্য করিয়া বলিতে গেলে ও করে নাই, আমি কেমন করিয়া নিজে থেকেই হইয়া গিয়াছি, কিন্তু...

যাক, উত্তর যাহা দিলাম তাহাই বলি। সিগারেট একটা হাতে দিয়া জল গড়াইতে গড়াইতে বলিলাম— "তোকে এ গরীবের বাড়িতে খেতে বলাই ভুল হয়েছে, চৌরঙ্গীর হাওয়া খাচ্ছিস আজকাল তুই!"

কথাটা এখনও বুকে যেন রক্তের দাগে বসিয়া আছে।

বীরু সিগারেটটা ধরাইয়া হেলিয়া পড়িয়া টানিতে টানিতে বলিল— "শুধু খাওয়াই নয়, তোদের পাড়াতেও আসা চলবে না আমার আর। একটা চেঞ্জ হিসেবে আসতাম, তা"... জল গড়াইতে গড়াইতে ঘুরিয়া প্রশ্ন করিলাম— "অপরাধ ?"

বীরুর চেহারাটি এক মুহূর্তেই যেন কি রকম হইয়া গেল। হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া উগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"অপরাধ অনেক। এখানে আর ভদ্রলোকের পা মাড়াবার জো নেই। এই গলিতে সাতষট্টিটি বাড়ি পার হয়ে এলাম তোদের এই বাড়িতে, তা এক এক করে গুণে দেখলাম প্রত্যেক বাড়ির দোর গোড়ায় দু'টি-তিনটি, দু'টি-তিনটি করে দাঁড়িয়ে, দু'বছরের থেকে সত্তর বছরের পর্যন্ত, কারুর কোলে ছ'মাসের শিশু—দেখলে অন্ন-প্রাশনের ভাত উঠে আসে—হাতে এক একটা করে মাটির বাসন—বড় জোর একটা লোহার শানকি—মুখে এক বুলি—'মা, একটু ফেন দাও মা!"... বোঝ্, একটা মানুষকে যদি এক থেকে সাতষট্টি পর্যন্ত প্রত্যেক বাড়ির দোর গোড়ায় এই এক হাবাতের বুলি শুনতে শুনতে আসতে হয় তো তার মেজাজের অবস্থা কি রকম হয়? বর্ধমান ডুবেছে কি মেদিনীপুর ডুবেছে, কি নদে খুলনায় ধান নেই তো তোরা সেইখানেই মরগে যা না,... যেন ভদ্দরলোকের পাড়াটাকে একেবারে বস্তিরও অধম করে তুলেছে!... আগে যখন আসতাম তোদের এই গলি দিয়ে—রেডিওতে রেডিওতে কান ঝালাপালা হোত--ঠিক এই রকম একঘেয়ে; তা যতই কিন্তু মারাত্মক হোক, সে একটা ভদ্র ব্যাপার ছিল তো... আর এ যে..."

আশ্চর্য যে না হইতেছিলাম এমন নয়, তবে সেই সঙ্গে আশ্বস্ত হইলাম। এইবার বাঁচিয়া যাইবে বীরু। চৌরঙ্গী অঞ্চলে উঠিয়াছে, ভাঙিয়া না বলুক, সঙ্গীদের মধ্যে 'কাপ্তেন' গোছের নিশ্চয় কেউ আছে। আর এই বস্তি-বিদ্বেষ,

এই যেন প্রার্থিনীদের উপর আক্রোশ;—প্রতিক্রিয়া সুরু হইয়াছে, বীরু বাঁচিয়া যাইবে।

চৌরঙ্গী অঞ্চলে গিয়াও কিন্তু চেহারার অবস্থা এমন কেন?—কতদিন হইল গিয়াছে?...যাই হোক এ সমস্যা লইয়া আর মাথা ঘামাইবার দরকার দেখিলাম না। কৌচের হাতলে একটা সিগারেট ঠুকিতে ঠুকিতে বলিলাম—"এইবার তোর সেই বিদকুটে বাইগুলো ছাড়।—আর কি—বয়েস হয়ে এল, এখন নিজের কথাও একটু ভাবতে হবে তো? না, সেবাধর্ম ভালো, নিন্দে করছি না, তবে নিজেকে বাঁচিয়ে..."

বীরু অন্যমনস্কভাবে শুনিতেছিল, হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিল—"নিজেকে বাঁচিয়ে কিছু দিতে পারবি?"

সামান্য একটু চিন্তা করিলাম। মনে মনে হাসিয়া নিজের মনেই বলিলাম, রোগ একদিনে যায় না, চৌরঙ্গীতে বাড়ি লইয়াও আর্তত্রাণ, সেবা, চাঁদাতোলা! উঠিয়া বলিলাম—"দাঁড়া দেখি, কি পারি স্পেয়ার করতে।"

দেরাজ খুলিয়া ওকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া মানিব্যাগটা হাতে করিয়া খুব খানিকটা হিসাব করিলাম, তাহার পর একটা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া লইলাম। দেরাজটা বন্ধ করিয়া ওর হাতে নোটটা দিয়া বলিলাম—"কতকগুলো খরচ আছে—ফারনিচারের একটা মোটা বিল পেমেন্ট করতে হবে, আপাতত এই কোন রকমে পারলাম।"

বারান্দার ওদিককার ঘরে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। বলিলাম—"রোস, একটু দেখে আসি কে।"

কি মনে হইল, সেকেন্ড কয়েক বাদ দিয়া একটি মিথ্যা জুড়িয়া দিলাম—"হয়তো ফারনিচারের বিলটার জন্যে, বড্ড তাগাদা লাগিয়েছে বেটারা।"

এ. ঘোষের ওখানে টি পার্টিতে ডাকিতেছে। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম বীরু নাই। কাঁচের টপ দেওয়া ছোট টেবিলের উপর অ্যাশ-ট্রে চাপা দেওয়া দশ টাকার নোটটার সঙ্গে একটা ছোট কাগজের টুকরায় পেন্সিলে লেখা—"আগে ফারনিচারের বিলটা শোধ দিয়ে দিস।"

দুইটা দিন চৌরঙ্গীর এমুড়ো ওমুড়ো সাধ্যমত অনুসন্ধান করিলাম—গ্র্যান্ড হোটেল পর্যন্ত বাদ দিলাম না। তৃতীয় দিন বীরুর দেখা পাইলাম—নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। কার্জন পার্কের উল্টা দিকে, যেখান থেকে বেহালা,

মেটিয়াবুরুজ ঐসব জায়গার বাস থামে, বুকে দুইটা হাত জড়াইয়া এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে হোয়াইটঅ্যাওয়ের দোকানটির পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চারিদিকে দশবারোটি কঙ্কালসার জীব—মানুষ বলা চলে না তাদের। কেহ ভিক্ষা চাহিতেছে, কেহ নির্জীবভাবে পড়িয়া আছে, কেহ হাতের পাত্র থেকে বাছিয়া বাছিয়া কি ভক্ষণ করিতেছে। দু' একটি শিশু আমসির মত স্তন হইতে সান্ত্বনা আহরণের চেষ্টা করিতেছে।...মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে বীরু। আজ গায়ে জামাটা পর্যন্ত নাই। ওর কাছে কেহ ভিক্ষা চাহিতেছে না, বেশ বোঝা যায় সর্বস্ব দিয়া ও এখন ওদেরই একজন। একটু কুণ্ঠা যে না হইল এমন এমন নয়, তাহার পর কাছে গিয়া ডাকিলাম—'বীরু!'

বীরু ধীরে ধীরে মুখটা ঘুরাইয়া আমার পানে চাহিল। দৃষ্টিটা শান্ত কিন্তু উদভ্রান্ত। চাহিয়া রহিল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। আরও কাছে সরিয়া গেলাম, প্রশ্ন করিলাম, "একি ব্যাপার? তুই এখানে?"

বীরু প্রতিপ্রশ্ন করিল—"চৌরঙ্গী নয় এটা?"

বলিলাম—"বাড়ি চল, পাগলামি করে না।"

বীরু নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাগ দেখাইতে হইল, বলিলাম—"এই তোর সেবা হচ্ছে? তুই নিজে ওদের সামিল হয়ে গেলে কি করে সেবা করবি? আজ ক'দিন ধরে আছিস এখানে তুই? তোর পাগলামির কি একটা সীমা থাকতে নেই? বাড়ি চল, আর আমিও তোর সঙ্গে কাজে নামছি, দেখি কতটা কি করতে পারি। লোকেদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে..."

বীরুর দৃষ্টিটা আরও উগ্র হইয়া উঠিল, বলিল,—"লোক সব মরেছে!—সব মরেছে একধার থেকে—সামনে হাত পেতে দাঁড়াবার যুগ্যি আর নেই লোক—তুই ঘুরবি, বলছিস,—আমি ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে ..'

আমায় কয়েকজন ঘিরিয়া ফেলিয়াছে—'একটি পয়সা দাও, দু'দিন থেকে কিছু খাইনি...বাবু, দেখ ছেলেটার পানে চেয়ে, একটা গেছে...নড়ে আর চাইতে পারি না বাবু..."

একটু দূরে একটা দশ-বারো বছরের মেয়ের উপর দৃষ্টি পড়িল, একখানি কৃষ্ণ-কঙ্কাল। কাহারও অপেক্ষা তাহার অভাবটা কম নয়—কিন্তু পূর্ণ উলঙ্গতার এত কাছাকাছি যে, সামনে আসিয়া হাত পাতিতে পারিতেছে না।

হঠাৎ একটা কর্কশ চীৎকারে ফিরিয়া চাহিলাম, বীরুর গলা। কোটর-গত চোখ দুইটি যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, শীর্ণ হাতটি বাড়াইয়া চেঁচাইতেছে—"সর, সরে যা সব, নৈলে এবার আমি খুন করব!...

তোদের জ্বালায় লোকে ফার্নিচার কিনে তার বিল শোধ করতে পারবে না?...সর্ সর্ সরে যা সব—আমি আর সামলাতে পারব না নিজেকে বলে দিচ্ছি,—সর!

আসিয়াই এক এক করিয়া চেয়ার টেবিল সব বিক্রয় করিয়া দিলাম। টাকা হাতে ছিল, কিন্তু মনে হইল সে টাকা বীরুকে বাঁচাইবার জন্য যথেষ্ট নয়। একবার মনে হইল টাকা লইয়াই যাই কিন্তু কেমন যেন সন্দেহ হইল তাহাতে ওকে ফেরান যাইবে না। চোরাবাজার হইতে দুই বোরা চাল, দুই বোরা ডাল সংগ্রহ করিয়া একটা ঠেলাগাড়ি ভাড়া করিয়া চৌরঙ্গীর দিকে যাত্রা করিলাম, বীরু আসে ভাল, নয়তো ইচ্ছামত সেখানে যদি সে সেবাকেন্দ্র খুলিতে চায় খুলুক।

বিক্রয় আর খরিদে সমস্ত দিনটা গিয়াছে, কাগজ পড়িবার ফুরসুৎ পাই নাই। চৌরঙ্গীর মোড়ে আসিতেই একটা ছোঁড়া একতাড়া কাগজ হাতে করিয়া সামনে দাঁড়াইল—"অ্যালাইজরা ইটালীতে নামল বাবু..."

একটা কাগজ কিনিলাম। প্রথমেই চক্ষু গিয়া পড়িল—কলিকাতার মৃত্যু সংখ্যা স্তম্ভের উপর; দৃষ্টিটা সেইখানে আটকাইয়া গেল।—কোন্ হাসপাতালে কতজন অনাহার-রুগ্ন ভর্তি হইল, কতজন মরিল; কোন্ রাস্তায় কত মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে তাহার হিসাব দিয়া লেখা আছে—চৌরঙ্গীর সামনে তিন; একজন ভদ্র-সন্তান বলিয়া অনুমিত, বয়স অনুমান সাতাশ বৎসর।

ঠেলাগাড়ি ফিরাইয়া যখন বাসায় আসিয়া পঁহুছিলাম, কন্যা আসিয়া হাতে একটি খাম দিল, বলিল,—"তুমি যখন চাল কিনতে গিয়েছিলে সেই সময় আসে।"

বেয়ারিং খাম। পেন্সিলে ঠিকানা লেখা। হস্তাক্ষর চেনা, তাড়াতাড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। বীরুই লিখিয়া গিয়াছে।—

"দুঃখ করিসনি, বোধ হয় তোর প্রতি অন্যায় করে গেলাম। একটা কথা বুঝতে পারলাম না, তাই মহাযাত্রীদের দলে ঢুকে পড়লাম—আমাদের বাঁচবার অধিকার রয়েছে অথচ উচ্ছিষ্ট দানের আশায় দিনানুদিন চেয়ে থাকি কেন?"

একটা কথা মাথায় ক্রমাগতই যে চক্র দিয়া ঘুরিতে লাগিল—'উচ্ছিষ্ট দান—উচ্ছিষ্ট দান—উচ্ছিষ্ট... সমস্ত দেশটায় একমাত্র ওরই এই কথা বলিবার অধিকার ছিল।

চিন্তার মধ্যেই একটা সন্দেহ জাগিল। কিন্তু যাহারা প্রতিদিন এই দান লইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে তাহারা তো একে উচ্ছিষ্ট বলে না।...নিজের কাছেই উত্তর পাইলাম,—"তাহাদের মুখে ভাষা নাই, থাকিলে তাহারাও ঠিক এই কথাই বলিত। যত মানুষ গেল আর যত যাইবে—সবার মনুষ্যত্বের প্রতিভূ হইয়া বীরেশ এই প্রশ্ন রাখিয়া গিয়াছে।"

দ্বীপের মানুষ

শ্রীমনোজ বসু

পাত্রপক্ষের প্রস্তাব ছিল বোটানিক্যাল গার্ডেনে। তাতে অমিতার মায়ের ঘোরতর আপত্তি—মাগো, বাইরের কতলোক—বেড়িয়ে বেড়াবে, মেয়ে দেখানোর সময় হাঁ করে চেয়ে রইবে, কি বিশ্রী! শেষে ঠিক হল, কোন্নগরের আড়পার তাঁদের এক আত্মীয়ের বাগানবাড়ি আছে—সেখানে গেলে কোন পক্ষের অসুবিধা হবে না, সে-ই সবচেয়ে ভাল।

দীঘির বাঁধানো চাতালে বসে আলাপ-পরিচয় হচ্ছে। পাত্রের মা অমিতাকে বড় পছন্দ করলেন; তাকে আদর করে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে নিজের হাতে মিষ্টি খাওয়ালেন। ওদিকে ভুবন মুখুজ্জেও হিরণকে বেহাই বলে ডাকতে শুরু করেছেন। বলেন, পাকাপাকি হয়ে যাক—আর কি! মেয়ে এ যাবৎ কম দেখিনি ভায়া, কিন্তু আমার চোখে লাগে তো গিন্নি বাতিল করেন; আবার দু'জনেরই পছন্দ হয়ে যায় তো কোষ্ঠি মেলে না। কলকাতার শহর তোলপাড় করে বেড়িয়েছি, কিন্তু পাব কোথায় বলুন? আপনি যে মা-লক্ষ্মীকে কাশীপুরের তেমহলার ভিতর সেবে রেখে দিয়েছেন।

তাঁরা বিদায় হলেন। বিপিন সরকার এসে অবধি ফাই-ফরমায়েস খাটছে, এই তৃতীয় দফায় তরিতরকারি সংগ্রহ করে ফিরে এল—ঝুড়ি ভরতি পুঁইশাক ও নটের ডাঁটা, ডান হাতে দড়িতে ঝোলানো দুটো মিঠে কুমড়ো। বলে, এখানে আর কিছু মিলবে না। বলেন তো ঘড়ি-ওয়ালা ঐ সাঁপুইদের বাগানে খোঁজ করি।

প্রভাবতী বলেন, থাকগে—অনেক হয়েছে। নেড়ে চেড়ে দেখে খুশি মুখে তারিপ করতে লাগলেন, বাঃ, বাঃ—তোমার পছন্দ আছে সরকার মশাই। কি রকম লকলকে ডগা, কি তেজালো!

বিপিন মহোৎসাহে বলে, শুনলাম মা ঘাটে এক একদিন টাটকা পোনা মাছ বিক্রি হয়। গঙ্গার মাছ মিষ্টি। মালিটাকে পাঠিয়ে দেব নাকি?

হিরণ বললেন, বিয়ে ঠিক হয়ে গেল বলে বিয়ের বাজারটাও অমনি সেরে যাচ্ছ নাকি? গন্ধমাদন করলে, নেবে কি করে? ট্যাক্সিতে যাবে না, মোষের গাড়ি ঠিক করতে হবে দেখছি।

না বাবা, নৌকোয় যাবো। অমিতা আবদার করে বলে, আবার গাড়িতে? বাপরে বাপ। রাস্তার ধুলোয় ভূত হয়ে গিয়ে তারপর একপ্রহর ধরে সাবান ঘষো। তার কাজ নেই, নৌকো ভাড়া করো, বাবা। ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে, দুলে দুলে চলবে। চমৎকার!

খুব হাসি, খুব স্ফূর্তি। প্রভাবতী বলে, হাসব না? ছেলে ছিল না ছেলে আসছে ঘরে। এক মেয়ে বলে খুকীর বড্ড দেমাক। ভাগীদার আসছে, এবারে জারিজুরি ভেঙে যাবে।

অমিতা চুপি চুপি বলে, ভাগ আদায় করতে এলে, কুশানের উপর পিন ফুটিয়ে রেখে দেবো। খোঁচা খেয়ে পালাবার পথ পাবে না।

মালপত্র নিয়ে বিপিন সরকার এবং দু'জন মালি আগে আগে যাচ্ছে, এরা একটু পিছনে। ঘাটের কাছাকাছি এলে দশ-বারো জনে ছেঁকে ধরল। কোথায় যাওয়া হবে কর্তা? এক্ষুনি নৌকো ছাড়বো। দু'-দু'খানা দাঁড়—উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

সম্মতির অপেক্ষা রাখল না, যে যা পারল কেড়ে কুড়ে হাঁটতে শুরু করেছে। বিপিন ছুটছে। ভাল মজা তো—কি মতলব তোদের? দাঁড়া—

ঘাটে পৌঁছে সবাই ডাকছে, আমার এই নৌকো... আসুন কর্তা, এই যে –

মৃদু হেসে হিরণ বলেন, এই আমার মেয়ে এই পরিবার, ইনি সরকারমশাই আর এই আমি। একটা নৌকোয় যাবার বাসনা ছিল। তা তোমাদের খাতিরে চারজনের না হয় চারটে নৌকোই করলাম। বিশ জনের মন রাখব কি করে, বাছা?

নিজেদের মধ্যে তখন তুমুল বচসা বেধে গেল, সর্বপ্রথম কে কোন জিনিস টেনে নিতে পেরেছে। মীমাংসা হয় না, মারামারির যোগাড়। মহানন্দে এঁরা কৌতুক উপভোগ করছেন।

দক্ষিণে আঘাটার দিকে দেবদারু ছায়ায় এক বুড়ো ডিঙি বেঁধে আপন মনে তামাক খাচ্ছিল। হিরণ এগিয়ে তার কাছে গিয়ে বলেন, ভাড়ায় যাবে না?

কেন যাবো না? চড়নদার পেলে যাই।

এমন জায়গায় বেঁধে বসে আছ। চড়নদার জানবে কি করে?

কি করি বাবু, বুড়োমানুষ—হাতাহাতি করে পেরে উঠিনে। ওরা এদিকে আসে না, বেশ চুপচাপ থাকা যায়।

ভাড়া জোটে?

বুড়ো বলে, তা জোটে বই কি কখনো। যে খায় চিনি, তারে জোটান চিন্তামণি। তা হুজুর, আমাদের তো চিনি নয়, দিনান্তে দু'মুঠো ভাত। কষ্টে সৃষ্টে চলে যায় একরকম। চড়নদারে না-ও যদি দেখে, আর একজন তো দেখছেন। তিনিই ঠেলেঠুলে নিয়ে আসেন। এই যেমন আপনাদের এনেছেন।

খিল-খিল করে হেসে অমিতা বলে, সে-তিনির আর কাজকর্ম নেই কিনা, তাই প্যাচপেচে কাদার মধ্যে মশার কামড় খেয়ে তোমার খদ্দের ঠেলে আনছেন।

ওদিকে ওদের বিবাদের আস্কারা হচ্ছে না। ঘড়ি দেখে ঘণ্টা-মিনিট ঠিক করে তো জিনিস ধরেনি, গলাবাজি একমাত্র প্রমাণ। আর ঈশ্বর-দত্ত গলা আছে সকলেরই! শেষ পর্যন্ত নাজেহাল হয়ে তারা বলে, বাবু, আপনারা বলে দিন কোন্ নৌকো নেবেন।

প্রভাবতী বুড়োর ডিঙিটা দেখিয়ে দিলেন। ধর্মভীরু মানুষ, কেমন ঠাণ্ডা কথাবার্তা...বুড়োকে তাঁর বড্ড ভাল লেগেছে।

আর মাঝিরা আশ্চর্য হয়ে বলে, ভৈরব তো মোটে যায়ইনি আপনাদের কাছে।

হিরণ বলেন, জ্বালাতন করতে যায়নি। সেই জন্যেই যাবো ঐ নৌকোয়। আর তোমাদের নামে যাচ্ছি থানায় রিপোর্ট করতে। প্যাসেঞ্জারের উপর রাহাজানি করো—সঙ্গে মেয়েছেলে রয়েছে, তাতেও সমীহ নেই।

মাঝিরা তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখে, বাবু, ভৈরবের নৌকোয় দাঁড়ি নেই। বোঠে বেয়ে যেতে যেতে রাত্তির হয়ে যাবে বললাম কিন্তু।

ভৈরব মাঝি এবার চোখ পাকিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বলল, যা-যা-যা। হিরণকে বলে, ন'বছর বয়স থেকে এই কর্ম করছি, হুজুর! দাঁড়ি না থাক, পাল খাটিয়ে দেব। পাখনা মেলে উড়ে চলবে নৌকো। ওদের আগে গিয়ে পেঁছিব।

হিরণ বললেন, তাড়াহুড়োর কাজ নেই, তুমি ধীরে-সুস্থে যেও, মাঝি। যাবো তো এই কুঠিঘাট। কতক্ষণ লাগবে?

ডিঙি ছাড়ল। ভৈরব ডাকে, ওঠ্ দিকিন কেষ্ট। বেলা পড়ে এল, আর কত ঘুমুবি? পালটা খাটিয়ে দে, বাবা—

কেষ্ট ওঠে না। হাতের হুঁকাটা দিয়ে ভৈরব একটা খোঁচা দিল। কেষ্ট তাতে পাশ ফিরে শুলো মাত্র।

হিরণ বলেন, ছেলে তোমার ভয়ানক আলসে।

আলসেমি নয় বাবু, ক্ষিধেয় নেতিয়ে পড়েছে। দুপুরে দু'পয়সার মুড়ি খেয়ে আছে। অত দরের চাল... তার উপর চড়নদারের এই অবস্থা দেখছেন। আপনার মতো ভদ্রলোক ক'জন আছে বাবু? ছেলেমানুষ--তা তো বুঝবে না! মুশকিল হয়েছে— কি যে করি ওকে নিয়ে—

প্রভাবতীর মায়ের প্রাণ মোচড় দিয়ে ওঠে। ডাকেন, খোকা—খোকা— ওরে কেষ্ট!

বাগানবাড়িতে সুপ্রচুর খাওয়া-দাওয়া হয়েছে, মিষ্টি-মিঠাই যা বাড়তি ছিল ওখানে কিছু বলি হয়েছে, আর নিয়ে যাচ্ছেন বাড়িতে চাকর-বাকর কতকগুলো রয়েছে—তাদের জন্য। কেষ্ট ঘুমের মধ্যে চোখ মিটমিট করে দেখছে। প্রভাবতী হাঁড়ির মুখ খুলেছেন— আর কুকুর যেমন আতু-উ-উ— বললে ছুটে আসে, তেমনি এসে খাবার একরকম কেড়ে নিয়ে কেষ্ট গবগব করে চিবোতে লাগল। বড় ঘরের বউ প্রভাবতী— হাত থেকে এ রকম অসভ্য ভাবে ছিনিয়ে নিল... কিন্তু রাগ না হয়ে তাঁর চোখে জল এসে গেল। বলেন, আমার এই মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা হয়ে গেছে, মাঝি। বিয়ের দিন তোমার আর কেষ্টর নেমন্তন্ন রইল। যেও কিন্তু, নিশ্চয় যেও—

খেয়ে দেয়ে কেষ্টর বিষম স্ফূর্তি লেগে গেল। কথার জাহাজ ছেলেটা, কেবলই বক-বক করছে। অমিতার প্রায় সমবয়সি, তার সঙ্গে ভাব জমে উঠল। কি ওটা মাঝখানে? ভাসছে, দুলছে? কেষ্ট যেন কত মুরুব্বি। বলে, কুমীর-কামট নয়— ওর নাম হল বয়া। বাতাস পোরা রয়েছে কিনা, কিছুতে ডুববে না।

গল্প জমে ওঠে, একবার মাতলার গাঙে বাসন্তীর চরের উপর কেষ্ট একটা কুমীরকে বাছুর ধরতে দেখেছিল। কুমীরটা পড়ে ছিল, যেন জঙ্গলের একখানা কাঠ ভাসতে ভাসতে এসে লেগেছে। বাছুর ঘাস খেতে খেতে যেই না কাছে এসেছে, অমনি তার পিছনের দুই ঠ্যাং আর দেহের খানিকটা মুখে পুরে গড়াতে গড়াতে কুমীর জলে পড়ল। চাষারা ক্ষেতে কাজ করছিল, হৈ-হৈ করে এলো। কিন্তু কোথায় কি— তীরের কাছে জলটা একটুখানি রাঙা হয়ে উঠল। ব্যস— আর কিছু নেই।

বড় বড় গাঙে রাত দুপুরে এক কাণ্ড হয়ে থাকে, শোনো। জলের ঠিক উপর দিয়ে আলগোছে পা ফেলে জিন-পরীরা ছুটে বেড়ায়। শোঁ-শোঁ করে আওয়াজ আসে, মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে ওঠে... তাই থেকে বোঝা

যায় বৃত্তান্ত। একবার এই ডিঙির গায়েই প্রায় ধাক্কা খেয়েছিল আর কি! টেমি নিভিয়ে দিয়ে এরা তখন নিঃসাড় হয়ে বসেছিল। কেষ্ট বাপকে সাক্ষী মানে, না বাবা?

ভৈরব হাসিমুখে সায় দেয়। সে বলে, কিন্তু এই মা-গঙ্গার বুকে কোন দিন ওসব আসতে পারে না, খুকি-দিদি। মাহাত্ম্য আছে কিনা!

অমিতা বলে, দু'ধারে এত ঘর-বাড়ি কল-কারখানা—এলে ওর মধ্যে জাঁতিকলের মতো আটকা পড়ে যাবে, সেই ভয়ে আসে না।

বলে সে হেসে উঠল।

শেষে তাকেও গল্প বলতে হয়, অবোধ বড় বড় চোখ দু'টি মেলে কেষ্ট চেয়ে থাকে। বইয়ে পড়া গল্প—এদের মতো স্বচক্ষে দেখা নয়। উঁচু পাঁচিলে ঘেরা চিক-খাটানো সেকেলে বড় বাড়ির মধ্যে সে মানুষ হয়েছে, আকাশের চাঁদ-সূর্য সেখানে উঁকি দিতে ভরসা পায় না, বাইরের আর কতটুকু দেখেছে! পায়ে হেঁটে নয়, বই পড়তে পড়তে মনের কল্পনায় অমিতা চলে যায় শিলাসংকুল দুর্গম অরণ্যে...কাঠ কাটছে আলিবাবা.. দস্যুরা মণিরত্ন নিয়ে এলো...চিচিংফাঁক—গোপন ভাণ্ডারে পৃথিবীর সব ঐশ্বর্য এনে জড় করে রেখেছে, বাপরে বাপ, চোখ ঝলসে যায়। দরজা খোলার মন্ত্র যারা জানে না, বনে জঙ্গলে না খেয়ে গাধা তাড়িয়ে কাঠ কেটে তাদের দিন কাটে।...আলিবাবা পথ পেয়ে গেছে।

খাসা গল্প, অতি চমৎকার গল্প। কেষ্ট উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। ভৈরবও তারিপ করে; প্রত্যাসন্ন সন্ধ্যার ঝিলিমিলি আলোয় একবার মনে ওঠে, ঐ রকম একটা ভাণ্ডারের পথ পেলে কেষ্টকে সে সোনার থালে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন সাজিয়ে খাওয়াত, কত খেতে পারে দেখত। দুধের ছেলে নিয়ে তাহ'লে কি গাঙে-খালে ঘুরে বেড়ায়? ঐ ফরশা মেয়েটির মতো ঐ রকম রেশমি কাপড় পরিয়ে তাকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে রাখত, ঐ রকম প্রাণমাতানো বাস বেরুত কেষ্টর গা দিয়ে। দেখতে তো মন্দ নয়—যত্ন করতে পারে না বলেই তো অমন রুক্ষ ছাই-ওড়া চেহারা।

খালের মুখ। বাতাস উঠেছে—গোলমেলে বাতাস। ঢেউ আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। আজকে ভরা পূর্ণিমা। পালে বাতাস বেধে ডিঙি কাত হয়ে পড়ল, একঝলক জলও উঠল।

সামলে...খুব সামলে। গাজি বদর বদর!

প্রভাবতী অমিতাকে জড়িয়ে আর্তনাদ করে উঠল। বিপিন সাহস দিচ্ছে, ভয় নেই মা, কোন ভয় নেই—

পালের দড়ি খুলে ফেল্, ওরে কেষ্ট। কড়া হাতে বৈঠা ধরে রয়েছে ভৈরব মাঝি, হাতে শিরা উপশিরা ফুলে উঠেছে। বলে ভয় কিসের মা-ঠাকরুণ? ঠাণ্ডা হন, নারায়ণের নাম করুন।

কেষ্টর বয়স কম, তাতে কি? এই রকম ক্ষেত্রে কি করত হয়, সে ভাল করে জানে। তাড়াতাড়ি পালের দড়ি খুলল। গ্রহের ফেরে ঠিক সেই সময়টা জোরে এল বাতাস। ডিঙি বোঁ করে পাক খেয়ে গেল। পালের কোণ বিষম বেগে আলগা হয়ে বেরুল। ছেলেমানুষ সামলাতে পারল না—সেই টানে একেবারে ধনুকের তীরের মতো ছিটকে পড়ল বিশ-পঁচিশ হাত দূরে খরস্রোতের মধ্যে।

ভাসছে আর চেঁচাচ্ছে, বাবা—বাবা গো!

ভয় কি বাবা, কোন ভয় নেই। পা আর এক হাত দিয়ে ভৈরব বৈঠা ধরে আছে, আর এক হাতে ছেলের দিকে গুণের দড়ি ছুঁড়ে দিচ্ছে। কেষ্ট ধরতে পারে না, ভেসে আরও দূরে চলে যাচ্ছে, এক হাতে দড়ি ঠিক মতো পেঁছয় না। বিপিন এসে দড়ি ছুঁড়তে লাগল। উপোস করে করে গায়ে সে রকম বল নেই, তার উপর এতক্ষণ জল টেনে নিস্তেজ হয়ে এসেছে—দড়ি গায়ের উপর পড়লেও কেষ্ট ধরতে পারছে না। হিরণ, প্রভাবতী, অমিতা চেঁচামেচি করছে, কাছাকাছি একটা নৌকা দেখা যায় না। কেষ্ট ডুবছে আর ভাসছে, জলে ভুড়ভুড় ছাড়ছে, আবার প্রাণপণ প্রয়াসে মাথা জাগিয়ে ডাকছে, বাবা—বাবা!

ভয় নেই খোকা, ঠাকুর রক্ষে করবেন।

হিরণ অধীর কণ্ঠে বলেন, ঝাঁপ দিয়ে পড়ো বুড়ো, ওকে টেনে আনো—

বোঠে ছাড়ি কি করে, বাবু? বড্ড তুফান—সব সুদ্ধ তলিয়ে যাব।... দাঁড় টানতে পারবেন? জোরে—জোর করে—

বিপিন দাঁড়ে বসেছে। অনভ্যস্ত হাত। টানের মুখে বে-কায়দায় মচাৎ করে দাঁড় ভেঙে গেল। আর দরকার নেই, ছেলে জলতলে তলিয়ে গেছে। শক্ত মুঠোয় বৈঠা ধরে ভৈরব পাথরের মতো বসে, যেন তার সম্বিৎ নেই। নিষ্পলক সে চেয়ে আছে আবর্তিত জলধারার দিকে যেখানে বাবা বলে ডাকতে ডাকতে অসহায় ছেলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পাকা মাঝি ভৈরব—তার হাতে কোনদিন নৌকা বানচাল হয়নি, আজও

হল না। আরও নৌকা এসে পড়ল। অনেক গণ্ডগোল ও হৈ-চৈয়ের পর তারা ঘাটে এসে পেঁছিল, তখন রাত্রি গভীর। ডিঙি বেঁধে ভাঁটা-সরে-যাওয়া কাদার উপরেই ভৈরব বসে পড়ল। এতক্ষণে হু-হু করে চোখে জল নেমে এল। দশ টাকার দু'খানা নোট প্রভাবতী তার হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে একটা ভাড়াটে গাড়িতে তাঁরা উঠে বসলেন।

যে শোনে, সেই ধন্য-ধন্য করে। ছোটলোক হলে কি হয়, এমন কর্তব্যপরায়ণ বড়দের মধ্যেও মেলে না। মাঝিমাল্লা মানুষ—সাঁতার কেটে ছেলেটাকে নিশ্চয় বাঁচাতে পারত, কেবল এদের মুখ চেয়ে তা করল না।

ভৈরব মনে মনে ভাবে—আপনার জনদের মধ্যে বলেছেও এ কথা—কষ্ট দেখে মা-গঙ্গা তার ছেলেকে কোলে তুলে নিয়েছেন। পেট ভরে খেতে দিতে পারত না, খাওয়া নিয়ে কত বকাবকি, মারধোর! আর চালের দর দিন দিন যা হচ্ছে, এর পর কি ঘটবে বলা যায় না। তা এখন সমস্তই চুকে গেল, ভাবনার কোন-কিছু থাকল না আর।

আর সে হিরণদেরও খুব গুণগান করে, কুড়ি কুড়িটা টাকা দিয়ে গেল—আহা, ভাল হোক ওদের। অমন মন যাদের, তাদের ভাল হবে বই কি! প্রভাবতী বলেছিলেন, টাকা-পয়সায় জীবনের দাম হয় না—আমরা তোমার কেনা হয়ে রইলুম, মাঝি।... দু'-দু'খানা নোটেও নাকি দাম শোধ হয়নি। বলে কি ওরা? বড্ড ভাল লোক—তাই অমন করে বলল। এক পয়সা না দিলেও কে কি করতে পারত,—আর ওদের কি দোষ? ভৈরব অন্তর দিয়ে আশীর্বাদ করে, নারায়ণ, ভাল কর ওদের—

ক'দিন শুয়ে বসে নানা চিন্তায় এই রকম কাটল। তারপর ঘাটে গিয়ে গলুয়ের উপর সে তার চিরকালের জায়গাটিতে বসে। এই পাঁচ-সাত দিনে ভয়ানক বুড়ো হয়ে পড়েছে, হাত আর চলতে চায় না। মাঝগঙ্গায় গিয়ে সে উন্মনা হয়ে পড়ে, জলের নিচে কে যেন ডাকছে, বাবা, বাবা! ভয় নেই খোকা, দড়ি ধর্...বৈঠা তাড়াতাড়ি জল থেকে তুলে ধরে, স্রোতের নিচে তার ছেলের মাথায় মেরে বসবে নাকি? ডিঙ্গি ঘুরে গেল, সওয়ারিরা ভয় পেয়ে গালিগালাজ করে। ভৈরব ভাবে, তাই তো—এ রকম করে কোনদিন পরের ছেলে-মেয়ে ডুবিয়ে মারব নাকি? সে সামাল হয়ে জোরে জোরে বৈঠা চালায়। কিন্তু কতক্ষণ? আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ভাবে, নৌকা বাওয়া আর হবে না দেখছি। কার জন্যে আর চালাব নৌকা? কুড়ি টাকা নগদ তবিলে রয়েছে, দিব্যি কেটে যাবে। যখন সে মোটে ন'বছরের ছেলে তার

বাপ বৈঠা ধরতে শিখিয়েছিল, সেই বৈঠা এতকাল পরে ছেড়ে দিতে হল। মাসখানেক পরে সে ডিঙিটাও বিক্রি করল। আর ক'টা দিনই বা? এই ভাঙিয়ে চুরিয়ে চলে যাবে একরকম।

ধান-চালের দর লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। চোদ্দ-পুরুষের মধ্যে কেউ কখনো শুনেছ, এক টাকায় এক সের চাল? নারায়ণ, তোমার সংসারে অন্যায় বেড়েছে, তাই একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে নাকি? রাস্তায় এক মিনিট দাঁড়ানো যায় না, মৃত্যুর ছায়া মুখে নিয়ে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষায় শত শত মানুষ ঘিরে ফেলে। রাতে ঘুমুতে পারবে না, হাজার হাজার নরনারী কন্ট্রোলের দোকানে নগদ দামে এক সের চাল কিনবার প্রত্যাশায় রাত্রি জাগছে, আধহাত বসবার জায়গা নিয়ে তাদের কলহ-মারামারির অন্ত নেই। ভাতের ফেন পোষা-গাইটাকে দিয়েছি—কারা তক্কে তক্কে ছিল, ফেনের হাঁড়ি গরুর মুখ থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে। কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে মানুষ ডাষ্টবিন থেকে উচ্ছিষ্ট খায়। শত সহস্র ধুঁকছে ঘরের কোণে, রাস্তার উপর মরে পড়ে থাকছে। সকালবেলা খবরের কাগজে দেখ, আজকে বিরানব্বুই জন কুড়িয়ে নেওয়া হয়েছে, আজকে একশ একান্ন...

আর দেখ, দেখ—ওদের ঘরে অর্গান বাজছে, কলহাস্যের বিরাম নেই, মোটরের ভিড়ে রাস্তা চলা দায়, সিনেমা-হলে জায়গা পাওয়া যায় না-- জিনিসের দাম বাড়ছে তিনগুণ, পাঁচগুণ, বিশগুণ। অফুরন্ত ওদের নোটের তাড়া, যেন নেশা ধরে গেছে ওদের। কুছ পরোয়া নেই—যে দামে হোক, কুপন যোগাড় করো—আনো মোটরের তেল, কেনো সোনা, কেনো ধান-চাল জায়গা-জমি। নারায়ণ, তোমার ধরিত্রীতে একমুঠো অন্ন পড়ে নেই—যেখানে যা ছিল ডাকাতেরা ভাণ্ডারে পুরে ফেলেছে। দরজা খোলার মন্ত্রটি যদি জানা যেত!

অবস্থা দেখে ভুবন মুখুজ্জে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। যখন তখন তাগিদ দিচ্ছেন, একটা তারিখ সাব্যস্ত করো ভায়া। শ্রাবণের মধ্যে হয়ে যাক, নইলে আবার অকাল পড়ে যাবে। যা দিনকাল আসছে, কে আছি কে নেই কিচ্ছু বলা যায় না। ছোট্ট মা'টিকে নিয়ে দুটো দিন আমোদ-আহ্লাদ করে যাই।

হিরণ ইতস্তত করেন। এই মন্বন্তরের মধ্যে এখন কি বিয়ে-থাওয়ার সময়? খাবার জিনিসপত্র বাজার থেকে যেন উড়ে গেছে। পোড়ার কয়লা—

সে-ও বাঘের দুধের মতো অমিল। বরঞ্চ অঘ্রাণ কি মাঘ মাসের দিকে—

ভুবন প্রবল বেগে ঘাড় নাড়েন। না-না-না, অবস্থা তখন আরও খারাপ হবে না, কে বলতে পারে? আমার কিছু দাবি-দাওয়া নেই, ভায়া। অসুবিধে হয়, এক ভরিও সোনা দেবেন না—ফুলের গয়না দিয়ে মেয়ে সম্প্রদান করবেন।

ফুলের গয়না হিরণ দেবেন, যেহেতু ও-মেয়ের গায়ে ফুলের আরও বাহার খুলে যায়। কিন্তু সোনা-জহরতে মুড়ে দিতেও আটকাবে না—সোনার ভরি যদি দু'শো টাকাই হয়, হোক না কেন। অসুবিধা সে দিক দিয়ে হচ্ছে না। ধরুন, এখন শহরে আলোর কড়াকড়ি—ছাতে উঠানে হোগলা দিতে দেবে না, ত্রিপল দিয়ে ঢাকতে হলেও অনুমতির জন্য হাঁটাহাঁটি করতে হবে। সাত নয়, পাঁচ নয়, একটি মাত্র মেয়ে—তার বিয়ের রোসনাই হবে না, বাজি পুড়বে না, জাঁকজমক তেমন যে কিছু করা যাবে তাও মনে হচ্ছে না—

অবশেষে মুখ কালো করে ভুবন বললেন, আসল কথা কি এই, না মনে মনে আর কিছু আছে? খোলসা করে বলুন।

শেষ পর্যন্ত মত দিতে হয়। ছাব্বিশে শ্রাবণ বিয়ে। সর্বাংশে উপযুক্ত পাত্র হাতছাড়া করা চলে না। বিশেষত ওঁদের যখন এত আগ্রহ।

মন্দিরের সামনে ভৈরব ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। দুপুরবেলা ঠাকুরের ভোগ দিয়ে জন পঁচিশকে এরা প্রসাদ বাঁটোয়ারা করে দেয়। পাকা ভোগ—মিহিচালের সুগন্ধ অন্ন। তারই মতো একজন খুব গোপনে তাকে খবরটা দিয়েছে। বেশি লোক-জানাজানি হয়নি; সকালবেলা সকলের আগে এসে দাঁড়িয়েছে, নির্ঘাৎ সে পেয়ে যাবে। কিন্তু যেন তারে তারে খবর হয়ে যায়। এক প্রহর হতে না হতে লোকারণ্য হয়ে গেল। দরজা খুলতেই মারামারি খুনোখুনি ব্যাপার। মানুষ ভাতের জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে। মায়ামমতা স্নেহসৌজন্য নেই, ভাত চাই—ভাত। পিছনের ধাক্কা খেয়ে বুড়ো ভৈরব মাটিতে পড়ে গেল, তাকে পায়ে পিষে হৈ-হৈ করে লোকগুলো ঢুকছে। সেবাইত ঠাকুরের দুই গোঁয়ার-গোবিন্দ ছেলে লাঠি নিয়ে দমাদম পিটছে—বেরো, বেরো—পঁচিশ জন পুরে গেছে।

ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ভৈরব উঠল। পাঁচদিন—পুরো পাঁচটা দিন ও রাত্রির মধ্যে মুখে ভাত ওঠেনি। ভাত খাওয়া যেন ভুলে গেছে। একটা পচা তাল জোগাড় করেছিল এক তরকারিওয়ালার কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে।

এই মাত্র পেটে গেছে। কোথায় যাবে সে? নারায়ণ, তোমার দুয়ারে এসেছিলাম—খেয়ে গেলাম লাঠির বাড়ি। ঢাক ঢোল বাজিয়ে পুজো হচ্ছে, ওর মধ্যে এদের কথা ঠাকুরের কানে ঢুকবে কি করে? গন্ধপুষ্পে ধূপের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে, ঠাকুর এদের দেখতে পান না। বড়লোকের মন্দিরে ঠাকুর আটকা পড়ে গেছেন।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। ভৈরব টলছে, আর চলতে পারে না। কৃপণ নিষ্করুণ পৃথিবী, তবু তার ধূলোয় হাতড়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। মস্ত বড় এক খাবারের দোকান। ভৈরব ও তার মতো আরও বিস্তর লোক সামনে দাঁড়িয়ে। অজস্র খাবার সাজানো, শুধু একখানা মাত্র কাচের ব্যবধান। যাদের টাকা আছে, ঝনাঝন টাকা ফেলছে, কাচের ভিতর দিয়ে হাত চালিয়ে দিচ্ছে, হাত ভরতি বেরুচ্ছে মনোলোভা রকমারি খাবার। কাচের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ওদিকে সারবন্দি ঝকঝকে চেয়ার-টেবিল। বিচিত্রবেশ নরনারী ঢুকছে, প্লেট পড়ছে টেবিলে। আর বাইরে খাদ্য-প্রত্যাশীরা নিশ্বাস নিরুদ্ধ করে অপেক্ষা করছে, ভাগ্যবানেরা খেয়ে-দেয়ে যখন উদ্গার তুলতে তুলতে বেরিয়ে যাবেন যদি ছিটেফোঁটা পড়ে এদিকে। কেউ তাকায় না—গটমট করে চলে যায়, রাস্তার উপরে অপেক্ষমান মোটরগুলা গর্জন করে ওঠে, ভকভক করে পিছনে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে উপহাস করে চলে যায়।...এরা ধুঁকছে, বাতাসে মুখ নাড়ছে, চলে বেড়াচ্ছে যেন কলের পুতুল। সুখাদ্যের কথা ভাবতে ভাবতে দুচোখ নিষ্প্রভ ও হৃৎস্পন্দন মৃদুতর হয়ে আসে। ওদিকে—উঃ, খাবারের পাহাড়! নারায়ণ, তোমার মানুষের এত সঞ্চয়, এত প্রাচুর্য! মাঝখানে একখানি মাত্র কাচ। এক টুকরা ইট ছুঁড়ে মারলেই ঝন-ঝন করে কাচ ভেঙে পড়বে—কে রুখবে? গুণতিতে ক'জন ওরা?...ভাঙো তবে ঐ ভঙ্গুর কাচের ব্যবধান—চুরমার করে দাও।...না,—না, সে হয় না।

কাচের আড়ালে ঐ জন আষ্টেক লোক যারা দেওয়া-থোওয়া করছে ভয় তাদের নয়; ধরে নিয়ে যাবে? জেল? সরকার বাহাদুর ঈশ্বরের চেয়েও দয়াবান—জেলের ভিতর এখনো ভাত দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে, বাতাস খেয়ে থাকতে হয় না। জেল তো জেল, ফাঁসি হলেই বা দুঃখ কি? তিল তিল করে মরার চেয়ে পলকের মধ্যে সব সাবাড়—সে ভালো, খুব ভালো।

কিন্তু কাচ নয়, কনেস্টবলও নয়, আরও রয়েছে। মাথার উপরে আছেন নারায়ণ। পাপ-পুণ্যের নিক্তি নিয়ে অতি-সতর্ক চোখে চেয়ে আছেন। ভয় তাঁকে, ভয় তাঁর রুক্ষ মার্জনাহীন দৃশ্যাতীত দৃষ্টির। যুগ যুগ কাল

কত চেষ্টা, কত পুণ্য কাব্যকথার মধ্য দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে ঈশ্বরের গৌরব। রাজারা দু'হাতে ঐশ্বর্য উজাড় করে কারুখচিত মন্দির গড়েছেন। এই যেমন আজ দুপুরে ভৈরব গিয়েছিল একটায়। খরচ করে ঠকেননি; মন্দিরবাসী দেবতা সতর্ক চোখে তাঁদের বিত্ত পাহারা দিচ্ছেন। আমার মুখে ভাত তুলে দেওয়া ঐ ঈশ্বরের কর্তব্য নয়,—তোমার বাড়তি ভাত আমি খেয়ে যদি বাঁচতে চাই, অনির্দেশ্য হুমকি এসে আমার হাত আড়ষ্ট করে দেবে! জয় হোক মহিমময় ঈশ্বরের। সার্থক ঈশ্বর ভক্তেরা, যাঁরা খরচপত্র ক'রে আকাশচুম্বী মন্দির গড়ে দিয়েছেন।

কে ও বেরুচ্ছে? বিপিন সরকার না? সে-ই। পিছনে ভারে ভারে দই-রাবড়ি, ক্ষীর-সন্দেশ যাচ্ছে। আটজনে বাঁকে করে নিয়ে চলেছে, তারা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

দাঁড়ান, ও সরকারমশাই, শুনুন একটা কথা। ছুটতে পারিনে—

বিপিন ভয় পেয়ে যায়, পঙ্গপালের মতো ক্ষুধার্তের দল—ঘিরে ফেলতে কতক্ষণ? সময় বড্ড খারাপ পড়েছে, কিছু বলা যায় না—সোনারূপো নিয়ে বেরুনো যায়, কিন্তু খাদ্য নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলা দায় হয়েছে। ভালয় ভালয় ফটক পার করে জিনিসগুলো ঘরে তুলতে পারলে সে বেঁচে যায়। বিপিন গতিবেগ আরও বাড়িয়ে দিল। ভৈরব ছুটছে আর চেঁচাচ্ছে, আস্তে চলুন সরকারমশাই, শুনুন না—

ভিতরে ঢুকে বিপিন সুস্থির হল। দারোয়ান রঘুনন্দন সিং ঘড়াং করে ফটক বন্ধ করে। লোহার গরাদে দেওয়া—ওদিকটা দেখা যাচ্ছে। উপর থেকে মধুর সুরে রসুনচৌকি বেজে উঠল, চারিদিক ফুল-পাতা আর রঙীন কাপড় দিয়ে সাজানো। সেই ফুটফুটে খুকিদিদিমণির বিয়ে তবে আজকে?

ভৈরব ডাকে, চিনতে পারছেন না সরকারমশাই? তাকিয়ে দেখুন তো। বাবুর সঙ্গে দেখা করব এটু—

যা-যা। বাবুর আর কাজকর্ম নেই কিনা—

বিপিন চলে যায়। ভৈরব আর্তচিৎকার করে বলে, আমার যে নেমন্তন্ন এখানে। আমি ভিতরে যাব।

মুখ ফিরিয়ে চেয়ে বিপিন হেসে উঠল। নেমন্তন্ন থাকে, বেশ তো—বাড়িতে মোটর যাবে। গাড়ি চড়ে চলে আসিস। এখন ক্ষমা দে, বাপু।

বন্দুক কাঁধে তুলে রঘুনন্দন সিং বেরিয়ে আসছে। বর আসবার সময় হয়ে এল, রাস্তা খালি করতে হবে। যারা ভিড় করেছিল, ছুটোছুটি

করে পালিয়ে যায়। রঘুনন্দন ভিতরে গেলে দু'-এক করে আবার এসে জোটে। বিকাল থেকে এইরকম চলছে।

বাঁদিককার গলি দিয়ে ভৈরব ঢুকে পড়ল। যেতে যেতে বাড়িটার পিছন অবধি গেল। দরজা খুঁজছে। গিন্নি নিজে তাকে নিমন্ত্রণ করেছেন-- এরা ঢুকতে দিল না—কিন্তু একবার কোন গতিকে তাঁর কাছে পেঁছিতে পারলে হয়। আঃ, কি দরদ—মা বলে সেই দয়াময়ীর পায়ের নিচে মাথা ঠেকাতে ইচ্ছে করে!...দরজা পাওয়া গেল, কিন্তু ভিতর থেকে বন্ধ। ভৈরব বড় রাস্তা অবধি চলে আসে, আবার যায়। দু'-তিনটে দরজা—কোনটা খোলা নেই। অনন্ত অপরিমিত রত্নভাণ্ডার সে চাচ্ছে না, শুধু পেটের খোরাকি। আলিবাবার মতো একটা মন্ত্র কেউ বলে দিত, ঝন-ঝন করে খুলে যেত দরজা!

গন্ধ বেরুচ্ছে, পিছনের রান্নাবাড়িতে কত কি রান্না হচ্ছে! হয়তো ভাত ফুটছে টগবগ করে...কতদিন ভাত গলায় ওঠেনি, যুগযুগান্তর বলে মনে হচ্ছে। ভৈরব যেন পাগল হয়ে ওঠে। হঠাৎ এক নজর প্রভাবতীকে দেখতে পেল। কি কাজে বড় ব্যস্ত হয়ে তিনি পিছনদিককার বারাণ্ডায় এসেছিলেন। ভৈরব প্রাণপণে ডাকে, মাঠাকরুণ, মা, মাগো—

অত উঁচু অবধি ডাক পেঁছিয় না। প্রভাবতী যেমন এসেছিলেন, তেমনি চলে গেলেন। যেন মত্তহস্তীর বল এলো বুড়ো ভৈরবের অস্থিসার দেহে! কাঠবিড়ালের মতো সে আঁচড়ে দেয়াল বেয়ে ওঠে। ঠাকরুণ রয়েছেন ঐখানে কোথাও। নিজের মুখে নিমন্ত্রণ করেছেন, আর কেউ না চিনুক তিনি ঠিক চিনবেন।

ঐ যে—দেখ দেখ, ঐ একটা!

এই মন্বন্তরের মাঝে চোর-ছ্যাঁচোড় ভিখারিরা কৌশলে ঢুকবার চেষ্টা করবে, আগে থেকে আন্দাজ করে চারিদিকে কড়া পাহারা মোতায়েন হয়েছে। ভৈরবের মাথা পাঁচিল ছাড়িয়ে উঠতেই ওদিক থেকে দিল এক লাঠির খোঁচা। আর্তনাদ করে সে মাটিতে পড়ল, উৎসব-বাড়ির আনন্দ-আয়োজনের মধ্যে সে শব্দ কারও কানে গেল না। রাস্তার উপর কণ্ট্রোলের দোকানের পাট এখন চুকে গেছে, ভিড় ছিল না, ক'জনে শুধু কয়লার দাগ কেটে নিজ নিজ জায়গা চিহ্নিত করছিল কাল সকালবেলাকার অনুষ্ঠানের জন্য। তারা ছুটে এল। ওরই মধ্যে একজন ভৈরবকে চিনিল, রজনী কয়াল তার নাম। কিছুদিন সে ভৈরবের নৌকোয় দাঁড়ির কাজ করেছিল, তখন খুব ভালবাসাবাসিও হয়েছিল।

ধরাধরি করে ভৈরবকে কলের কাছে নিয়ে এল। ভিড় জমেছে পথ চলতি মানুষ নানা জনে নানা মন্তব্য করছে। অসৎ কর্মের ফল হাতে হাতে—পাঁচিল টপকে যেমন চুরি করতে গিয়েছিল! সাহসও বলিহারি যাই মশায়, ঐ তো হাড় ক'খানা—সে উঠেছে অত উঁচুতে?... রজনী যথাসাধ্য করছে, জল দিয়ে রক্ত ধুইয়ে দিল, মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। ভৈরব এক-একবার হাঁ করছে। কানের কাছে মুখ নিয়ে উচ্চকণ্ঠে রজনী বলে, ও দাদা, তেষ্টা পেয়েছে? জল খাবে?

অর্ধ-অচেতন ভৈরবের মুখ থেকে জড়িত স্বরে বেরিয়ে আসে, উঁহু—ভাত দে, চাট্টি ভাত—

রজনীর চোখে জল এসে যায়। নিতান্ত সরল এই ভালোমানুষটি মরবার আগে একমুঠো ভাত খেতে চায়। কিন্তু এ যে কংসরাজার বদ ফরমাস—চারিদিকে রাস্তার ধুলো-জঞ্জাল, কোথায় পাবে ভাত? ভৈরব নিষ্প্রভ চোখে চেয়ে হাঁ করে আছে, সাগ্রহে ঠোঁট নাড়ছে.... কি দেবে ঐ মুখে?

ভাত তো নেই, দাদা—

রাঁধছে?

মৃত্যুপথযাত্রীকে রজনী নিরাশ করতে চায় না। আর কতক্ষণই বা। বলল, হ্যাঁ—ফুটছে। এই হয়ে এল। ততক্ষণ জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নাও, লক্ষ্মী দাদা আমার—

ভাত ফুটছে! নূতন রূপশালি চালের ভাত, ভুরভুরে গন্ধ। নবান্ন হয় এই চালে। আর একটু সবুর করতে হবে—একটুখানি মাত্র। ভৈরবের মুখে অনন্ত আগ্রহের ছবি। হয়ে এলো রান্না... ছোটবেলায় মা যেমন তাকে বলত ঘুমুসনি খোকা—হয়ে এল; উঠে বোস, ঘুমুস নি—

কিন্তু ঘুম বড় জড়িয়ে আসছে চোখের পাতায়। জাগ্রত হয়ে থাকতে সে চেষ্টা করছে—কিন্তু চেতনা স্তিমিত হয়ে আসে, সব যেন ধোঁয়া হয়ে তালগোল পাকিয়ে যায়। রজনী কান্নাজড়িত কণ্ঠে তার কানে কানে বলে, গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম। ও দাদা, ঠাকুরের নাম করো। এ জন্মে যা হবার হল—পরজন্মটা বরবাদ না হয়।

চিরদিনের ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ!—ছেলে ডুবেছে, তা-ও মনে করে ঠাকুরের কোলে আছে। সে আজ চরমক্ষণে গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম বলছে না, ঈশ্বরের উপর কৃতজ্ঞতার কোন কারণ নেই। সেই ন'বছর বয়স থেকে শীত নেই, বর্ষা নেই—চিরকাল সে খেটে এসেছে, কোনদিন অবহেলা করেনি,

জীবনে একটা পয়সা অপব্যয় করেনি, কোন অন্যায় বা পাপ করেনি---তবু সে খেতে পরতে পেল না। ধরিত্রীর সব ধান-চাল, টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় চল্লিশ-ডাকাতে গুপ্ত-ভাণ্ডারে নিয়ে রাখল, বন্ধ দরজায় সে খুরে মরেছে, কিছুতে দোর খুলল না। মৃত্যুক্ষণে ভৈরবের ঠোঁট নড়ছে—ঠাকুরের নামগান করবার জন্য নয়—ভাতের আশায়, ভাত দে... ভাত... ভাত...

পরদিন সকালে দিনক্ষণ খুব ভালো, বর-কনে বিদায় হবে। সানাই বাজছে। শুভকর্মে চোখের জল ফেলতে নেই, থমথমে মুখে হিরণ ঘোরাফেরা করছেন। কাল রাতে বাড়িময় গণ্ডগোলের মধ্যে তাঁর খাওয়া হয়নি; অমিতা যাবার আগে বাবাকে জোর করে খেতে বসাল। হিরণ বলেন, তুই বোস খুকী, নইলে কিন্তু আমি গালে তুলছি না। আসন টেনে নিয়ে অমিতাকেও বসতে হয়। বাপ নিজে খাচ্ছেন, আর কচি খুকিটির মতো অমিতার গালে তুলে তুলে দিচ্ছেন। আর বাধা মানে না, চোখের জলের ধারা বইল। সানাই করুণরাগিণীতে আলাপ করছে, প্রাণের ভিতর আলোড়িত হয়ে ওঠে।

ফুলে ফুলে সাজানো মোটর গাড়ি—যেন বিজ্ঞানযুগের ইস্পাতের যান নয়, কল্পলোকের বিচিত্র একটি ময়ূর। দেশটাও যেন কল্পলোকের। ফুল আর খই ছড়াচ্ছে উপর থেকে। ফুটফুটে ছেলেমেয়ের দল, সুশ্রী সুগৌর-তনু কত তরুণী—দামি কাপড়চোপড় পরা, দামি দামি গহনা ঝিকঝিক করছে, মুখে মুখে হাসি—হাসির তরঙ্গ উৎসারিত হয়ে এদিকে সেদিকে পড়ছে. উগ্রমধুর সেণ্টের গন্ধে ভারাক্রান্ত বাতাস... অপরিমিত ঐশ্বর্য। এই অপূর্ব মনোহর মানুষগুলিও যেন মাটির পৃথিবীর নয়—রূপকথায় যে রাজপুত্র-রাজকন্যাদের কথা শুনে থাকি তারাই। লনের দক্ষিণ দিকটায় ত্রিপল-ঢাকা অস্থায়ী শেডটার নিচে গত রাত্রের বাড়তি ঝুড়ি ঝুড়ি সন্দেশ, পোলাও, ফ্রাই, লুচি। এর একটা বিলিব্যবস্থা করতে হবে, বিপিন সরকার ভয়ানক ব্যস্ত।

এ যেন দ্বীপের মতো, বাইরের থেকে বিচ্ছিন্ন, একেবারে স্বতন্ত্র। এই নরনারীরা কাঁদতে শেখনি, হাহাকার জানে না, বিশ্রী নিরলংকার ভাবে অভাব-অনটনের কথা বলতে পারে না, কেবল সুমিষ্ট হাসি, শালীন হিউমার, উঁচুধরনের কথাবার্তা। অগণ্য মানুষের জীবন-সংঘর্ষে লোনা ঢেউ চারিদিকে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে—মাঝখানে এরা নারিকেলমর্মরিত শান্ত সুস্নিগ্ধ মায়া-কুঞ্জ রচনা করেছে।

গেট থেকে বেরিয়েই ব্রেক কষে মোটর থামাতে হয়। রাস্তায় পড়বার মুখে আড়াআড়ি খানিকটা জায়গা জুড়ে শুয়ে আছে মানুষটা। ড্রাইভার চেঁচিয়ে ওঠে, এই উল্লুক! সত্যি, কি রকম বেকুব—এ কি একটা শোবার জায়গা? চাপা পড়লে তখন তো ড্রাইভারকে নিয়েই টানাটানি!

হঠ যাও। এই উল্লু।

এত চিৎকার চেঁচামেচি, তবু ওঠে না। রেগে গরগর করতে করতে ড্রাইভার নেমে জুতো সুদ্ধ পায়ের লাথি উঁচিয়েছে... পা'টা নামিয়ে নিল। ঘুম নয়, মরে গেছে বেটা। মুশকিল! জন দুই ভিতর থেকে ছুটে এসে মড়াটা ড্রেনের দিকে গড়িয়ে দিল। রওনা হবার মুখে কি অলক্ষণ! কালকের ভোজে ময়দা লেগেছিল, খালি বস্তাগুলো পড়ে আছে—তাব গোটা দুই এনে ঢেকে দিল, যাবার সময় মড়া দেখতে না হয়। মুখটা চেনা নাকি? যেন ভৈরবের মতো। না-ও হতে পারে। ক্ষুধা-বিশীর্ণ বীভৎস ওদের সব মুখের চেহারা মোটামুটি এক—তোমার আমার মুখ নয় যে আলাদা করে চেনা যাবে।

কিন্তু ক'টিকে ঢাকা চলে ময়দার বস্তায়? শুয়ে আছে, বসে আছে—আরও কত! বসে থেকে ক্ষুধা-লোলুপ চোখে যারা তাকাচ্ছে, তারা আরও ভয়ানক; মড়া জ্যান্ত হয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকালে যে রকমটা হয় তেমনি। অমিতা শিউরে তাড়াতাড়ি মোটরের কাচ তুলে দেয়; রাস্তার দিক থেকে চোখ সরিয়ে বরের দিকে তাকায়। বরও তাকিয়ে আছে পরম রূপসী নববধূর দিকে। ব্যস... আর তো কেউ নেই, মাত্র এরা দু'টি। দু'জনের মুখে মধুর হাসি ফুটে উঠল। চালাও জোরে... জোরে... আরও জোরে। তীব্র হর্ন দাও, রাস্তা ছেড়ে ওরা সব ছুটে পালাক। গাড়ি এখনই গিয়ে দাঁড়াবে আর এক প্রকাণ্ড গেটের ভিতরে মার্বেলবাঁধানো প্রকাণ্ড সিঁড়ির পাশটিতে। ততক্ষণ এ-ওর দিকে চোখ চেয়ে ঠেঁশাঠেঁশি হয়ে বসে থাকো তোমরা। এক দ্বীপ থেকে আর এক নিরাপদ দ্বীপে যাচ্ছে, মাঝের লবণাক্ত সমুদ্রটুকু চোখ-কান বুজে কোন রকমে কাটিয়ে দিতে পারলে হয়।

কে বাঁচায়, কে বাঁচে!

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন আপিস যাবার পথে মৃত্যুঞ্জয় প্রথম মৃত্যু দেখল—অনাহারে মৃত্যু। এতদিন শুধু শুনে আর পড়ে এসেছিল ফুটপাথে মৃত্যুর কথা, আজ চোখে পড়ল প্রথম। ফুটপাথে হাঁটা তার বেশি প্রয়োজন হয় না। নইলে দর্শনটা অনেক আগেই ঘটে যেত সন্দেহ নেই। বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু'পা হেঁটেই সে ট্রামে ওঠে, নামে গিয়ে প্রায় আপিসেরই দরজায়। বাড়িটাও তার সহরের এমন এক নিরিবিলি অঞ্চলে যে সে-পাড়ায় ফুটপাথও বেশি নেই, লোকে মরতেও যায় না বেশি। চাকর ও ছোট ভাই তার বাজার ও কেনাকাটা করে।

কয়েক মিনিটে মৃত্যুঞ্জয়ের সুস্থ শরীরটা অসুস্থ হয়ে গেল। মনে আঘাত পেলে মৃত্যুঞ্জয়ের শরীরে তার প্রতিক্রিয়া হয়, মানসিক বেদনাবোধের সঙ্গে চলতে থাকে শারীরিক কষ্টবোধ। আপিসে পেঁছে নিজের ছোট কুঠরিতে ঢুকে সে যখন ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল, তখন সে রীতিমত কাবু হয়ে পড়েছে। একটু বসেই তাই উঠে গেল কলঘরে। দরজা বন্ধ করে বাড়ি থেকে পেট ভরে যত কিছু খেয়ে এসেছিল ভাজা, ডাল, তরকারী, মাছ, দই আর ভাত, প্রায় সব বমি করে উগড়ে দিল।

পাশের কুঠরি থেকে নিখিল যখন খবর নিতে এল, কলঘর থেকে ফিরে মৃত্যুঞ্জয় কাঁচের গ্লাসে জল পান করছে। গ্লাসটা খালি করে নামিযে রেখে সে শূন্যদৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল।

আপিসে সে আর নিখিল প্রায় সমপদস্থ। মাইনে দু'জনের সমান, একটা বাড়তি দায়িত্বের জন্য মৃত্যুঞ্জয় পঞ্চাশ টাকা বেশি পায়। নিখিল রোগা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং একটু আলসে প্রকৃতির লোক। মৃত্যুঞ্জয়ের দু'বছর আগে বিয়ে করে আট বছরে সে মোটে দু'টি সন্তানের পিতা হয়েছে। সংসারে তার নাকি মন নেই। অবসর জীবনটা সে বই পড়ে' আর একটা চিন্তাজগৎ গড়ে তুলে কাটিয়ে দিতে চায়।

অন্য সকলের মত মৃত্যুঞ্জয়কে সেও খুব পছন্দ করে। হয়তো মৃদু একটু অবজ্ঞার সঙ্গে ভালও বাসে। মৃত্যুঞ্জয় শুধু নিরীহ শান্ত দরদী ভাল মানুষ বলে নয়, সৎ ও সরল বলেও নয়, মানবসভ্যতার সবচেয়ে প্রাচীন ও

সবচেয়ে পচা ঐতিহ্য-আদর্শবাদের কল্পনা-তাপস বলে। মৃত্যুঞ্জয় দুর্বলচিত্ত ভাবপ্রবণ আদর্শবাদী হলে কোন কথা ছিল না, দুটো খোঁচা দিয়ে ক্ষেপিয়ে তুললেই তার মনের পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার বেরিয়ে এসে তাকে অবজ্ঞেয় করে দিত। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শ্লথ, নিস্তেজ নয়। শক্তির একটা উৎস আছে তার মধ্যে, অব্যয়কে শব্দরূপ দেবার চেষ্টায় যে শক্তি বহু ক্ষয় হয়ে গেছে মানুষের জগতে তারই একটা অংশ। নিখিল পর্যন্ত তাই মাঝে মাঝে কাবু হয়ে যায় মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে। মৃদু ঈর্ষার সঙ্গেই সে তখন ভাবে যে নিখিল না হয়ে মৃত্যুঞ্জয় হলে মন্দ ছিল না।

মৃত্যুঞ্জয়ের রকম দেখেই নিখিল অনুমান করতে পারল, বড় একটা সমস্যার সঙ্গে তার সংঘর্ষ হয়েছে এবং সার্শিতে আটকানো মৌমাছির মত সে মাথা খুঁড়ছে সেই স্বচ্ছ সমস্যার অকারণ অর্থহীন অনুচিত কাঠিন্যে।

কি হল হে তোমার? নিখিল সন্তর্পণে প্রশ্ন করলে।

'মরে গেল! না খেয়ে মরে গেল!' আনমনে অর্ধভাষণে যেন আর্তনাদ করে উঠল মৃত্যুঞ্জয়।

আরও কয়েকটি প্রশ্ন করে নিখিলের মনে হল, মৃত্যুঞ্জয়ের ভিতরটা সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। ফুটপাথে অনাহারে মৃত্যুর মত সাধারণ সহজ-বোধ্য ব্যাপারটা সে ধারণা করতে পারছে না। সেটা আশ্চর্য নয়। সে এক সঙ্গে পাহাড়প্রমাণ মালমশলা ঢোকাবার চেষ্টা করছে তার ক্ষুদ্র ধারণা-শক্তির থলিটিতে। ফুটপাথের ওই বীভৎসতা ক্ষুধা অথবা মৃত্যুব রূপ? না খেয়ে মরা, কি ও কেমন? কত কষ্ট হয় না খেয়ে মরতে, কি রকম কষ্ট? ক্ষুধার যাতনা বেশি না মৃত্যুযন্ত্রণা বেশি—ভয়ংকর?

অথচ নিখিল প্রশ্ন করলে সে জবাবে বলল অন্য কথা।—'ভাবছি, আমি বেঁচে থাকতে যে লোকটা না খেয়ে মরে গেল, এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি? জেনে-শুনেও এতকাল চার বেলা করে খেয়েছি পেট ভরে। যথেষ্ট রিলিফ ওয়ার্ক হচ্ছে না লোকের অভাবে, আর এদিকে ভেবে পাই না কি করে সময় কাটাব। ধিক্ শত ধিক্ আমাকে।'

মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ ছল ছল করছে দেখে নিখিল চুপ করে থাকে। দরদের চেয়ে ছোঁয়াচে কিছুই নেই এ জগতে। নিখিলের মনটাও খারাপ হয়ে যায়। দেশের সমস্ত দরদ পুঞ্জীভূত করে ঢাললেও এ আগুন নিভবে না ক্ষুধার, অন্নের বদলে বরং সমিধে পরিণত হয়ে যাবে। ভিক্ষা দেওয়ার মত অস্বাভাবিক পাপ যদি আজও পুণ্য হয়ে থাকে, জীবনধারণের অন্নে

মানুষের দাবী জন্মাবে কিসে? রূঢ় বাস্তব নিয়মকে উল্টে মধুর আধ্যাত্মিক নীতি করা যায়, কিন্তু সেটা হয় অনিয়ম। চিতার আগুনে যত কোটি মড়াই এ পর্যন্ত পোড়ানো হয়ে থাক, পৃথিবীর সমস্ত জ্যান্ত মানুষগুলিকে চিতায় তুলে দিলে আগুন তাদেরও পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

বিক্ষুব্ধ চিত্তে এই সব কথা ভাবতে ভাবতে নিখিল সংবাদপত্রটি তুলে নিল। চোখ বুলিয়ে যেতে যেতে নজরে পড়ল, ভালভাবে সদ্গতির ব্যবস্থা করে গোটা কুড়ি মৃতদেহকে স্বর্গে পাঠানো হয়নি বলে এক স্থানে তীক্ষ্ণধার হা-হুতাশভরা মন্তব্য করা হয়েছে।'

ক'দিন পরেই মাইনের তারিখ এল। নিখিলকে প্রতিমাসে তিন যায়গায় কিছু কিছু টাকা পাঠাতে হয়। মনিঅর্ডারের ফর্ম আনিয়ে কলম ধরে সে ভেবে ঠিক করবার চেষ্টা করছে তিনটি সাহায্যই এবার পাঁচ টাকা করে কমিয়ে দেবে কিনা। মৃত্যুঞ্জয় ঘরে এসে বসল। সেদিনের পর থেকে মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ বিষণ্ণ গম্ভীর হয়ে আছে। নিখিলের সঙ্গেও বেশি কথা বলেনি।

'একটা কাজ করে দিতে হবে ভাই।' মৃত্যুঞ্জয় একতাড়া নোট নিখিলের সামনে রাখল।—'টাকাটা কোন রিলিফ ফাণ্ডে দিয়ে আসতে হবে।'

'আমি কেন?'

'আমি পারব না।'

নিখিল ধীরে ধীরে টাকাটা গুনল।

'সমস্ত মাইনেটা?'

'হ্যাঁ।'

'বাড়িতে তোর ন'জন লোক। মাইনের টাকায় মাস চলে না। প্রতিমাসে ধার করছিস।'

'তা হোক। আমায় কিছু একটা করতেই হবে ভাই। রাতে ঘুম হয় না, খেতে বসলে খেতে পারি না। এক বেলা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আমার আর টুনুর মা'র একবেলার ভাত বিলিয়ে দি'।

নিখিল এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। জ্বর হলে যেমন দেখায় মৃত্যুঞ্জয়ের গোলগাল মুখখানা তেমনি থম থম করছে। ভেতরে সে পুড়ছে সন্দেহ নেই।

'টুনুর মা'র যা স্বাস্থ্য, একবেলা খেয়ে দিন পনের-কুড়ি টিকতে পারবে।' মন্তব্য শুনে মৃত্যুঞ্জয় ঝাঁঝিয়ে উঠল।—'আমি কি করব? কত বলেছি,

কত বুঝিয়েছি, কথা শুনবে না। আমি না খেলে উনিও খাবেন না। এ অন্যায় নয়? অত্যাচার নয়? মরে তো মরবে না খেয়ে।'

নিখিল ভাবছিল বন্ধুকে বুঝিয়ে বলবে, এ ভাবে দেশের লোককে বাঁচানো যায় না। যে অন্ন পাওয়া যাচ্ছে সে অন্নতো পেটে যাবেই কারো না কারো। যে রিলিফ চলছে তা শুধু একজনের বদলে আর একজনকে খাওয়ানো। এতে শুধু আড়ালে যারা মরছে তাদের মরতে দিয়ে চোখের সামনে যারা মরছে তাদের কয়েকজনকে বাঁচানোর চেষ্টা করার সান্ত্বনা। কিন্তু এসব কোন কথাই সে বলতে পারল না, গলায় আটকে গেল।

সে শুধু বলল,---ভূরিভোজনটা অন্যায়, কিন্তু না খেয়ে মরাটা উচিত নয় ভাই। আমি কেটেছেঁটে যতদূর সম্ভব খাওয়া কমিয়ে দিয়েছি। বেঁচে থাকতে যতটুকু দরকার খাই এবং দেশের সমস্ত লোক মরে গেলেও যদি সেইটুকু সংগ্রহ করার ক্ষমতা আমার থাকে, কাউকে না দিয়ে নিজেই আমি তা খাব। নীতিধর্মের দিক থেকে বলছি না, সমাজধর্মের দিক থেকে বিচার করলে দশজনকে খুন করার চেয়ে নিজেকে না খাইয়ে মারা বড় পাপ।'

'ওটা পাশবিক স্বার্থপরতা।'

কিন্তু যারা না খেয়ে মরছে তাদের যদি এই স্বার্থপরতা থাকত? এক কাপ অখাদ্য গ্রুয়েল দেওয়ার বদলে তাদের যদি স্বার্থপর করে তোলা হত? অন্ন থাকতে বাঙলায় না খেয়ে কেউ মরত না। তা সে অন্ন হাজার মাইল দূরেই থাক আর একত্রিশটা তালা লাগানো গুদামেই থাক।'

'তুই পাগল নিখিল। বদ্ধ পাগল।' বলে মৃত্যুঞ্জয় উঠে গেল।

তারপর, দিন দিন কেমন যেন হয়ে যেতে লাগল মৃত্যুঞ্জয়। দেরী করে আপিসে আসে, কাজে ভুল করে, চুপ করে বসে ভাবে, এক সময় বেরিয়ে যায়। বাড়িতে তাকে পাওয়া যায় না। সহরের আদি অন্তহীন ফুটপাথ ধরে সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। ডাস্টবিনের ধারে, গাছের নিচে, খোলা ফুটপাথে যারা পড়ে থাকে, অনেক রাত্রে দোকান বন্ধ হলে যারা হামাগুড়ি দিয়ে সামনের রোয়াকে উঠে একটু ভাল আশ্রয় খোঁজে, ভোর চারটে থেকে যারা লাইন দিয়ে বসে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃত্যুঞ্জয় তাদের লক্ষ্য করে। পাড়ায় পাড়ায় লঙ্গরখানা খুঁজে বার করে অন্নপ্রার্থীর ভিড় দেখে। প্রথম প্রথম সে এইসব নর-নারীর যতজনের সঙ্গে সম্ভব আলাপ করত। এখন সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। সকলে এক কথাই বলে। ভাষা ও বলার ভঙ্গি পর্যন্ত তাদের এক ধাঁচের। নেশায় আচ্ছন্ন অর্ধচেতন মানুষের প্যানপ্যানানির মত

ঝিমানো সুরে সেই এক ভাগ্যের কথা, দুঃখের কাহিনী। কারো বুকে নালিশ নেই, কারো মনে প্রতিবাদ নেই। কোথা থেকে কি ভাবে কেমন করে সব ওলোট পালোট হয়ে গেল তারা জানেনি, বোঝেনি, কিন্তু মেনে নিয়েছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ির অবস্থা শোচনীয়। টুনুর মা বিছানা নিয়েছে, বিছানায় পড়ে থেকেই সে বাড়ির ছেলে বুড়ো সকলকে তাগিদ দিয়ে দিয়ে স্বামীর খোঁজে বার বার বাইরে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু এই বিরাট সহরের কোথায় আগন্তুক মানুষের কোন জঞ্জালের মধ্যে তাকে তারা খুঁজে বার করবে! কিছুক্ষণ বাইরে কাটিয়ে তারা ফিরে আসে, টুনুর মাকে মিথ্যা করে বলে যে মৃত্যুঞ্জয় আসছে—খানিক পরেই আসছে। খবর দিয়ে বাড়ির সকলে কেউ গম্ভীর, কেউ কাঁদ কাঁদ মুখ করে বসে থাকে, ছেলেমেয়েগুলি অনাদরে অবহেলায় ক্ষুধার জ্বালায় চেঁচিয়ে কাঁদে।

নিখিলকে বার বার আসতে হয়। টুনুর মা তাকে সকাতর অনুরোধ জানায়, সে যেন একটু নজর রাখে মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে, একটু যেন সে সঙ্গে থাকে তার।

নিখিল বলে, 'আপনি যদি সুস্থ হয়ে উঠে ঘরের দিকে তাকান তাহ'লে যতক্ষণ পারি সঙ্গে থাকব, নইলে নয়।'

টুনুর মা বলে, 'উঠতে পারলে আমিই তো ওর সঙ্গে ঘুরতাম ঠাকুরপো।'

'ঘুরতেন?'

'নিশ্চয়। ওঁর সঙ্গে থেকে থেকে আমিও অনেকটা ওঁর মত হয়ে গেছি। উনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন, আমারও মনে হচ্ছে যেন পাগল হয়ে যাব। ছেলেমেয়েগুলির জন্য সত্যি আমার ভাবনা হয় না। কেবলি মনে পড়ে ফুটপাথের ওই লোকগুলির কথা। আমাকে দু'তিন দিন সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে টুনুর মা আবার বলে, 'আচ্ছা, কিছুই কি করা যায় না? এই ভাবনাতেই ওঁর মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কেমন একটা ধারণা জন্মেছে, যথাসর্বস্ব দান করলেও কিছুই ভাল করতে পারবেন না। দারুন একটা হতাশা জেগেছে ওঁর মনে। একেবারে মুষড়ে যাচ্ছেন দিনকে দিন।'

নিখিল শোনে আর তার মুখ কালি হয়ে যায়।

মৃত্যুঞ্জয় আপিসে যায় না। নিখিল চেষ্টা ক'রে তার ছুটির ব্যবস্থা করিয়ে দিয়েছে। আপিসের ছুটির পর সে মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে যায়— মৃত্যুঞ্জয়ের ঘোরাফেরার স্থানগুলি এখন অনেকটা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেও মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে কাটিয়ে দেয়, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ভাবে তাকে উল্টো কথা শোনায়, নিজের আগেকার যুক্তিতর্কগুলি নিজেই খণ্ড খণ্ড করে দেয়। মৃত্যুঞ্জয় শোনে কিন্তু তার চোখ দেখেই টের পাওয়া যায় যে কথার মানে সে আর বুঝতে পারছে না, তার অভিজ্ঞতার কাছে কথার মার-প্যাঁচ অর্থহীন হয়ে গেছে। ক্রমে ক্রমে নিখিলকে হাল ছেড়ে দিতে হয়।

তারপর মৃত্যুঞ্জয়ের গা থেকে ধূলিমলিন সিল্কের জামা অদৃশ্য হয়ে যায়। পরনের ধুতির বদলে আসে ছেঁড়া ন্যাকড়া, গায়ে তার মাটি জমা হয়ে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। দাড়িতে মুখ ঢেকে যায়। ছোট একটি মগ হাতে আরও দশজনের সঙ্গে সে পড়ে থাকে ফুটপাথে আর কাড়াকাড়ি মারামারি ক'রে লঙ্গরখানার খিচুড়ি খায়। বলে, 'গাঁ থেকে এইছি। খেতে পাইনে বাবা। আমায় খেতে দাও!'

রাজধানীর রাস্তায়

শচীন সেনগুপ্ত

কলিকাতা শহরের অন্ধকার-প্রায় রাস্তার চৌমাথা। বিলাসী আর মোহিনী সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। শীর্ণ চেহারা, মলিন বেশ। চরণ ক্লান্ত, দৃষ্টিতে শঙ্কা ও উদ্বেগ।

বিলাসী : অত করে বনন্ পা চালিয়ে চল, আঁধারে কিছু ঠাওর হবেনি। শুনলিনে। এখন বল্, কোন পথে যাই।

মোহিনী : অচেনা ঠাঁই বলে মনে হয় মাসি।

বিলাসী : থাক্ দাঁড়িয়ে হেথায়।

মোহিনী : হেই মা চন্ডী, পথ দেখিয়ে দাও মা। আমার ছেলেপুলেরা না খেয়ে রয়েচে।

(তাহাদের পিছনে একটি লোক আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার নাম হারাধন)

বিলাসী : চাল আঁচলে রয়েছে, এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে কর ছেলেপুলেরা পেটভরে খাচ্ছে।

মোহিনী : পথ দেখিয়ে দাও মা, পথ দেখিয়ে দাও।

হারাধন : কোন্ পথ খুঁজছ তোমরা?

বিলাসী : ঘুঘুড্যাঙার পথ গো!

হারাধন : ঘুঘু কখনো দেখেছ?

বিলাসী : কে রে মিন্সে এলো মস্করা করতে?

হারাধন : আরে চট কেন? পথের সাথী তোমরা একটু হাসি ঠাট্টাও করব না?

মোহিনী : বলে দাও না বাছা কোন্ পথে যাব ঘুঘুড্যাঙায?

হারাধন : আঁচলে ও দুলছে কি?

মোহিনী : ও সের খানেক চাল। তিনটে অবধি লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে পেনু।

হারাধন : পেলে তাহ'লে!

মোহিনী : কাল পাইনি আজ পেনু।

বিলাসী : কি বক্ বক্ করছিস্ অচেনা একটা মানুষের সঙ্গে।

হারাধন : অচেনা বলছ কি গো! এই ত চিন-পরিচয় হয়ে গেল। তোমরাও চাল খোঁজ, আমিও চাল খুঁজি।

বিলাসী : চাল খুঁজিস ত কনট্রোলে যা। আমাদের কাছে কি?

হারাধন : তোমাদের কাছেই যে রয়েছে চাল।

মোহিনী : এ ত আমরা আনলাম।

হারাধন : এনেছ বেশ করেছ, এইবার ছেলের কোঁচড়ে ঢেলে দাও।

বিলাসী : আমার ছেলেপুলে খাবে কি!

হারাধন : আমিও ত চাইছি আমার ছেলেপুলের জন্যে। তারাও না খেয়ে রয়েছে।

মোহিনী : তুমি পুরুষ মানুষ, যা-হোক করে যোগাড় কর।

হারাধন : এই তো যাহোক করেই যোগাড় করছি। দাও আঁচল খুলে ঢেলে দাও।

মোহিনী : ও মাসি, এ বলে কি!

বিলাসী : তখুনি বলেছিনু শহর-ঠাঁই, সন্ধ্যোয় গুণ্ডো বেরোয়: এখন পনু এই গুণ্ডোর হাতে।

হারাধন : গুণ্ডো বল, ষণ্ডা বল, গরু বল, সব সইব—শুধু ওই চাল ক'টা ঢেলে দাও।

বিলাসী : হ্যাঁ, দোব বৈকি! বাপের ঠাকুর এলে দোব না, তা তোকে দোব! দূর হ! দূর হ এখান থেকে!

হারাধন : তবে রে মাগী!

(আঁচলের চালের পুঁটুলী চাপিয়া ধরিল)

বিলাসী : ওরে বাবা গো, মেরে ফেললে গো, ডাকাত গো! চাল কেড়ে নিলে গো!

হারাধন : চুপ! চুপ! অমন করে চেঁচাসনে!

মোহিনী : মা চণ্ডী রক্ষে কর! মা চণ্ডী রক্ষে কর!

(হারাধনের টানাটানিতে বিলাসীর আঁচলের গেরো খুলিয়া চাল পড়িয়া গেল)

বিলাসী : পথে ছড়িয়ে দিলি!

হারাধন : তুই আর চেঁচাসনে। আমি কুড়িয়ে নিচ্ছি।

(বসিয়া কুড়াইতে লাগিল)

বিলাসী : আমার ছেলেপুলেরা খাবে কি?

(হারাধন মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল)

হারাধন : তারা কি সত্যিই না খেয়ে আছে?

বিলাসী : সকালে কিছু খেতে পাবে না।

হারাধন : আর আমার ছেলেমেয়েরা কাল সকাল থেকে কিছু খায়নি। আমি খালি হাতে বাড়ি ফিরতে পারিনি। তাইত এই চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম কোন্ পথে পা বাড়াব। তোমরা এলে, একটা উপায় হোলো। এই নিলাম সব কুড়িয়ে। এখন বাড়ি ফিরতে পারব।

বিলাসী : ফেরাচ্ছি তোকে ঘাটের মড়া!

(বলিতে বলিতে একখানা ইট তুলিয়া লইয়া হারাধনের মাথায় মারিল)

হারাধন : মেরে ফেল্লে রে! মেরে ফেল্লে! মেরে ফেল্লে!

(বলিয়া হারাধন মাথা গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল)

মোহিনী : তুমি খুন করলে মাসি!

(মনোহর আগাইয়া আসিল)

মনোহর : শহরের চৌরাস্তায় খুনো-খুনী করছ কারা হে তোমরা?

মোহিনী : হেই বাবু, চেয়ে দ্যাখ কি করতে কি হয়ে গেল!

মনোহর : আরে! তোমার মাথা দিয়ে যে রক্ত পড়ছে।

হারাধন : অন্ধকারে গ্যাসপোস্টে ঘা লেগেছে বাবু। রক্ত মাথায় উঠেছিল, বেরিয়ে যাচ্ছে।

মনোহর : এখানে গ্যাসপোস্ট কোথায়?

হারাধন : যাও, যাও আর কৈফিয়ৎ চেয়ো না। আমরা জ্বলচি আমাদের জ্বালায়।

বিলাসী : দেখি বাছা কোথায় লেগেছে।

(হারাধনের পাশে বসিল)

হারাধন : আর একটু জোরে মারলে না কেন মাসি? মরে বাঁচতাম।

মনোহর : তোমরা মেয়েছেলে এখানে কি করছ?

মোহিনী : আমরা বাপু পথ চিনতে পারছি না।

মনোহর : কোথায় যাবে?

মোহিনী : ঘুঘুড্যাঙায়।

মনোহর : ঘুঘুড্যাঙায় যাবে তা এখানে এসেছ কেন?

মোহিনী : কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে?

মনোহর : ডাইনে এসে পড়েছ যেতে হবে বাঁয়ে।

মোহিনী : ও মাসি শুনছিস।

বিলাসী : শুনছি মা।

মোহিনী : ওঠ, চল!

বিলাসী : লোকটা যে উঠচে না! এ আমি কি করলাম রে মোহিনী!

মনোহর : কি গো! তুমি অমন করে কেঁদে উঠলে কেন? হয়ত দু'তিন দিন না খেয়ে ছিল, চাল পেয়ে আনন্দে কাঁসি হারিয়ে ছুটে যাচ্ছিল, খেল গ্যাসপোস্টে ধাক্কা, ঠিকরে এসে পলো এখানে। যেমন পলো তেমনিই মলো। এম্নি রোজই ওরা মরে।

বিলাসী : ওকি! তুমি চাল কুড়িয়ে নিচ্ছ কেন?

মনোহর : রক্তমাখা বলছ? তা হোক্। ওকে ত বাঁচাতে পারব না, চালগুলো রেখে দিলে অপর কাউকে বাঁচাতে পারব।

বিলাসী : তুমি বলচ কি!

মনোহর : বাছা ঘুঘুড্যাঙায় যাবে ত বাঁদিকে সোজা চলে যাও। বাড়ি পেঁছুতে রাত ভোর হয়ে যাবে।

বিলাসী : তা আমার চাল দিয়ে দাও।

মনোহর : মরা লোকে কথা কয় না জেনে চাল দাবী করছ। কিন্তু জেনো, মিছে কথা বললে ভূতে ঘাড় ভাঙবে!

মোহিনী : চলে আয় মাসি, চলে আয়। আমার এই চালের আধা ভাগ তোকে দোব।

মনোহর : তোমার কাছেও চাল আছে নাকি!

মোহিনী : সের খানেক পেয়েছি আজ।

মনোহর : দিয়ে যাও।

মোহিনী : বাঃ রে! তোমাকে দেব কেন?

মনোহর : দেবে আমি চাইছি বলে।

মোহিনী : তোমাকে ভয় কি? তুমি ত গুণ্ডো নও, ভদ্দর লোক।

মনোহর : ভুল করছ হে।

মোহিনী : গায়ে জামা, পায়ে জুতো, ভুল কেন করব? হেই মাসি, ওঠ্, চল্।

বিলাসী : কিন্তু এ লোকটা যে ওঠেও না, নড়েও না।

মনোহর : দাও গো দাও, চালগুলো দিয়ে দাও, নইলে পুলিস হাঙ্গামায় পড়বে।

মোহিনী : না, বাবা পুলুস ডেকোনি বাবা, পুলুস ডেকোনি। মাসির দোষ নেই, আমারও দোষ নেই।

মনোহর : চাল দাও। সব দোষ ঢাকা পড়বে।

মোহিনী : এই নাও বাবু। দু'দিনের চেষ্টায় যোগাড় করেছিলাম। তোমাকেই ঢেলে দিলাম।

(মনোহর থলে ধরিল, মোহিনী তাহার আঁচলের চাল তাহাতে ঢালিয়া দিল এবং বলিল :)

চলে আয় মাসি।

(হারাধন মুখ তুলিয়া চাহিল)

হারাধন : একটু দাঁড়াও মাসি।

বিলাসী : এই যে বাছা আমার কথা কয়েছ।

হারাধন : দাঁড়াও মাসি, একটু দাঁড়াও।

(অতি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল। টলিতে টলিতে মনোহরের কাছে গিয়া কহিল :)

এই বাবু, ওদের চাল দিয়ে দাও।

মনোহর : কাদের চাল?

হারাধন : এই মেয়েছেলে দুটোর।

মনোহর : মাইরি আর কি! আপিস থেকে আমি রেশন নিয়ে এলাম।

হারাধন : চোট্টা শালা। দে ওদের চাল ফিরিয়ে।

(মনোহরের জামার কলার চাপিয়া ধরিল)

বিলাসী : না বাবা, তুমি আর ঐ নিয়ে মারধোর করতে যেওনি। বড় দুব্‌লা হয়ে পড়েচ!

মোহিনী : তুই চলে আয় মাসি, ওরা মরুক মারামারি করে।

মনোহর : এই জামা ছিঁড়ে যাবে, ছেড়ে দে বলছি।

হারাধন : তুই শালা আগে চাল ফিরিয়ে দে!

মনোহর : মাতলামো করবার আর যায়গা পাওনি।

হারাধন : মাতলামো করতে হলে মদ খেতে হয়। ভাত জোটে না, মদ খেয়ে মাতলামো করব! দাও ওদের চাল।

মনোহর : দাঁড়াও আগে তোমাকে চালান দি, তারপর ওদের চাল দোব।

(মুখে আঙুল দিয়া সিটি দিল)

হারাধন : পুলিস ডাকচ?

মোহিনী : তুই কি যাবিনি মাসি?

বিলাসী : বাছা, তুমি উঠে দাঁড়িয়েচ, এইবার আমরা চললাম। চাল আমাদের ছেলেমেয়েদের ভোগে লাগল না, পার ত তোমার ছেলেমেয়েদের মুখে তুলে দিয়ো। বললে, কাল সকাল থেকে তারা না খেয়ে রয়েছে!

হারাধন : দাঁড়াও না মাসি, একটুখানি দাঁড়াও না।

(অন্ধকার হইতে দু'টি লোক বাহির হইয়া আসিল, কানাই আর পরেশ)

কানাই : সংকেতি-সিটি কে দিলিরে।

মনোহর : এদিকে আয়রে কানাই।

কানাই : কিরে মোনা?

মনোহর : আরে দ্যাখনা ভাই, একশালা মাতালের পাল্লায় পড়িচি! আপিস থেকে চাল নিয়ে চলিচি, আর ও বলে কিনা ও-চাল ওই মেয়ে দুটোর।

পরেশ : মার না শালাকে!

হারাধন : তোমরা ভদ্দরলোক, আমার কথা শুনবে না। এই মেয়ে-ছেলে, দু'টি চাল নিয়ে যাচ্ছিল...

বিলাসী : না বাবারা আমাদের চাল নয়।

মনোহর : শুনলিরে শালা!

কানাই : মার শালাকে! একদম মেরে ফ্যাল্।

(হারাধনকে ঘুসি মারিল। হারাধন পড়িয়া গেল)

পরেশ : মেরে ফেললি নাকিরে!

কানাই : ধুপ করে পড়ে গ্যাল ধুমসো ব্যাটা। গায়ে এতটুকু জোর নেই!

মনোহর : হয়ত ক'দিন না খেয়ে আছে।

কানাই : চল্ সরে পড়ি।

মনোহর : দূর দূর সরে পড়তেই বা হবে কেন? সবাই বুঝবে পথে

যখন পড়ে আছে, না খেয়েই মরেছে নির্ঘাৎ। এখন কার গোয়ালে কেই বা ধোঁয়া দেয়।

পরেশ : তাহ'লে মোনা, চালটা এবার ছাড় ভাই।

মনোহর : ছাড়ব বলেই ত ধরিচি। কত দিবি বল।

পরেশ : আছে কত।

মনোহর : সের দুই।

পরেশ : কনট্রোলের দরে ছেড়ে দে।

মনোহর : খুব যে দরাজ হাত তোর!

পরেশ : দিয়ে দে ভাই, ঘরে আজ চাল নেই।

মনোহর : তাহ'লে দর বাড়া। শ্রীমন্ত সাধুখাঁ শুনলাম কনট্রোলের দরের ওপর দু'আনা বেশি ধরে দিচ্ছে। তাকেই দিয়ে আসব।

পরেশ : শ্রীমন্ত সাধুখাঁর বয়ে গেছে দু'সের চাল কিনতে।

মনোহর : তাই নাকি!

পরেশ : কি বলিসরে কানাই?

কানাই : আরে দু'সের দু'সের করেই যে দু'দশ মণ হয়ে যায়। আজ সকালে পাড়ার পাঁচটা ছোঁড়াকে টিকিট দিয়ে লাইনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলাম, সবাইকে বিড়ি খেতে দিলাম একটা করে পয়সা, আর এক পয়সা দিলাম ফুলুরি কিনতে—এই দ্যাখ থলেয় আমার পাঁচ সের চাল!

পরেশ : আমায় ওথেকে দু'সের দে না ভাই। চাল না নিয়ে আমার ঘরে ফেরা দায় হবে।

কানাই : মাপ করতে হচ্ছে। শ্রীমন্ত সাধুখাঁর সরকারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, পাড়ার ছেলেদের দিয়ে এমনি যত চাল আমি কনট্রোল থেকে যোগাড় করব, সব সে কিনে নেবে সের পিছু দশ পয়সা বেশি দিয়ে।

পরেশ : আরে আমি যে চাইছি নিজের বাড়ির জন্যে।

কানাই : তা ঐ মোনার ঠেঁয়ে নিয়ে যা।

পরেশ : ও শালাও যে মুনাফা ছাড়া দিতে চায় না।

কানাই : কেন দেবে? এই যুদ্ধের বাজারে দু'পয়সা মুনাফা করবে না!

পরেশ : তোরা বন্ধুলোক মুনাফা খাবি?

মনোহর : ওরে শালা, ভাই বন্ধু এখন কিছুই নেই। তুই যেদিন বাগে পাবি, নিস্ আমার ঘাড় ভেঙে। দেখিস্ আমি কথাটিও কইব না।

পরেশ : শোন্ শালার যুক্তি।

কানাই ! যা, যা, বক্ বক্ করিসনে।

(পরেশ খপ করিয়া মনোহরের হাত চাপিয়া ধরিল)

পরেশ : দে শালা চাল দে।

কানাই : ছেড়ে দে পরেশ, মোনার হাত ছেড়ে দে বলছি। দলের লোক হয়ে কেন মার খাবি?

পরেশ : আমি আর তোদের দলের নই। ঘরে চাল নেই, দলের লোক ব'লে তোদের যদি দরদ না থাকে, চাই না দলে থাকতে। ধরিচি যখন চাল আমি নেবই।

মনোহর : চাল তুই নিবিই!

পরেশ : নোবই।

(ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে লাগিল)

মোহিনী : তুই কি আজ যাবিনি মাসি?

বিলাসী : উঠতে পারচি না মা। আমার মাথা ঘুরচে।

মোহিনী : ক্ষিধেয়?

বিলাসী : না মা ক্ষিধে কোথায়? ভাবছি, কেন মরতে এয়েছিলাম কনট্রোলে। এক সের চেলের লেগে এই মারামারি কাটাকাটি!

পরেশ : তুই আমায় মারলি কানাই।

পরেশ : ও চাল আমি নোবই।

কানাই : দে মোনার চাল ছেড়ে।

(একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক অগ্রসর হইলেন। তাঁহার নাম চাটুজ্যেমশাই)

চাটুজ্যে : এই যে বাবা পরেশ। গলা পেয়ে ছুটে এলাম। দাও বাবা চাল দাও। গিন্নি হাঁড়িতে জল চাপিয়ে বসে আছে বাবা।

পরেশ : শালারা যে দিতে চায় না চাটুজ্যেমশাই।

চাটুজ্যে : দিয়ে দাও বাবারা, দিয়ে দাও। এক আনা করে বেশি ধরে দোব। পরেশকে রোজ তাই দি।

মনোহর : এই শালা পরেশ! তুই যে বললি চাল তোর নিজের বাড়ির জন্যে দরকার?

চাটুজ্যে : তা বাবা আমার বাড়ি ওর নিজেরই বাড়ি। আমার মিনু যে পরেশ-দা বলতে অজ্ঞান!

কানাই : দে মোনা, চাটুজ্যে মশাইকে চাল দিয়ে দে।

মনোহর : কনট্রোলের দরের ওপর দু' আনা বেশি দিতে হবে!

চাটুজ্যে : মরে যাব বাবারা, মরে যাব। সের প্রতি সাত আনা দোব, পরেশকে যা দিয়ে থাকি!

মনোহর : সাড়ে সাত আনা দিন।

চাটুজ্যে : কেন, সাড়ে সাত আনা কেন? হকের পয়সা বেহক যাবে।

মনোহর : না দেবেন ত সরে পড়ুন।

চাটুজ্যে : পড়লাম আর কি সরে! এ-আর-পি ডাকব না? পুলিস ডাকব না?

কানাই : শুনুন শুনুন, চাটুজ্যেমশাই। আর দুটো করে পয়সা ধরে দিন।

চাটুজ্যে : এক পয়সাও না।

কানাই : এই শালা মোনা!

(মনোহরকে টানিয়া একটু দূরে লইয়া গিয়া চাপা গলায় কহিল :)

চাটুজ্যেকে ঘাঁটাসনি। দিয়ে দে। আর তুই ত শালা দাম দিয়ে কিনিসনি।

মনোহর : বন্ধুলোক বলছিস। দিই দিয়ে।

কানাই : নিন চাটুজ্যেমশাই।

চাটুজ্যে : দেবেই ত! সোনার ছেলে তোমরা বাবারা। তোমরা থাকতে কি পাড়ার লোক আমরা না খেয়ে মরব? কাঁকর মেশানো নেই ত বাবা! একি হ্যা? চাল যেন ভিজে মনে হচ্ছে।

মনোহর : ও কিছু নাঃ! ছটাক কয়েক রক্ত হয়ত পড়েছিল।

চাটুজ্যে : রক্ত বলছ কি হে!

মনোহর : আরে মশাই আপনার ত লাভ হয়ে গেল! টাটকা রক্তে

যা ফল হবে মাছ মাংসে তা হোত না। এক সঙ্গে আহার আর ওষুধ দুই-ই।

কানাই : বেশ বলিচিসরে শালা। নিয়ে যান চাটুজ্যেমশাই, নিয়ে যান।

চাটুজ্যে : কিসের রক্ত তা না জেনে...

(আঁধার হইতে হারাধন অতি কষ্টে কহিল :)

হারাধন : গোরক্তও বলতে পার কত্তা।

চাটুজ্যে : গোরক্ত! নারায়ণ! নারায়ণ!

হারাধন : গোরক্ত হারাম হলে, শেয়াল-কুকুরেরও ভাবতে পার।

চাটুজ্যে : আঁধারে থেকে তুমি কে কি বলছ হে!

হারাধন : আজ্ঞে ঠিকই বলচি কত্তা, তোমরাই বোঝ না মানুষ, গরু, শেয়াল, কুকুর সব আজ একাকার। কিছু তফাৎ নেই।

মনোহর : শালা মরছে তবু বুকনি ঝাড়তে ছাড়চে না।

কানাই : চল্ শালার থোতা মুখ ভোঁতা করে দি!

(ক্যাঁচর করিয়া মোটর ব্রেকের শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে হে'ই হে'ই শব্দ)

পরেশ : মোলো ব্যাটা মোটরের তলে।

কানাই : চলে আয় মোনা, চলে আয় পরেশ, মোটরওয়ালাকে ধরি।

(মোটরের মালিক তখন নামিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার নাম ধনেশবাবু)

ধনেশ : একে ঘুটঘুটে অন্ধকার, তায় পায়ে পায়ে লোক শুয়ে থাকবে।

কানাই : তাই বলে লোকগুলোকে আপনি মোটর চাপা দিয়ে মেরে ফেলবেন?

ধনেশ : ও ত মরেই পড়ে ছিল!

মনোহর : মরেই পড়ে ছিল!

ধনেশ : ছিল না? চোখ চেয়ে পথ চল যদি, দেখবে খেতে না পেয়ে যেখানে সেখানে লোক মরে পড়ে আছে।

কানাই : পথ চলে চলে আমাদের পা ক্ষয়ে গেল, আর আপনি মোটর থেকে মাটিতে পা দিয়েই বলছেন পথের খবর আমরা রাখি না!

ধনেশ : থাম থাম ছোকরা, জ্যাঠামো করো না। স্টার্ট দাও ড্রাইভার।

পরেশ : স্টার্ট দেবে কি মশাই! লোকটার কোন ব্যবস্থা করবেন না?

ধনেশ : এই দ্যাখ, কিচ্ছু তোমরা জান না। পথের মড়া ঘাটের মড়া নয় যে চট করে চিতেয় চাপিয়ে দেওয়া যায়। থানায় খবর যাবে, ডাক্তারি পরীক্ষা হবে, গবর্নমেণ্টে রিপোর্ট যাবে লোকটা ক'দিন না খেয়ে ছিল, কতটুকু ফ্যাট প্রোটিন কার্বো-হাইড্রেট পেটে থাকলে ও মরত না—তারপর ত হবে ওর সৎকারের ব্যবস্থা। তুমি ছেলেমানুষ, এ-সবের বোঝ কি!

(চাটুজ্যেমশায় আগাইয়া আসিয়া কহিলেন :)

চাটুজ্যে : ছেলে-ছোকরা ওরা হয়ত বোঝে না। কিন্তু আমাকে বাজে ধাপ্পায় ভোলাতে পারবে না। চল থানায় চল!

ধনেশ : কেন, থানায় যাব কেন?

চাটুজ্যে : শুধু খবরটা দেব যে, চৌরাস্তায় একটা লোক না খেয়ে মরে আছে।

ধনেশ : খবর দিতে হয় আপনারাই যান। জলদি চলো ড্রাইভার! বাড়ি পেঁছেই আবার ভবেশকে পাঠাতে হবে শ্রীমন্ত সাধুখাঁর দোকানে।

কানাই : শ্রীমন্ত সাধুখাঁর দোকানে কি হচ্ছে মশাই?

ধনেশ : কি হচ্ছে?

মনোহর : মহোচ্ছব হচ্ছে নাকি?

ধনেশ : গোলমাল না করে এখুনি যদি আমায় যেতে দাও, খবরটা তোমাদের দিয়ে যাই।

পরেশ : বলুন মশাই। শ্রীমন্ত সাধুখাঁর সঙ্গে আমাদের কারবার আছে।

ধনেশ : কারবার আছে ত এখানে দাঁড়িয়ে জটলা করচ কেন? গুদোম যে সে সাবাড় করছে।

কানাই : শ্রীমন্ত সাধুখাঁ!

ধনেশ : কারবারি লোক সে! চালের দাম বেঁধে দেওয়া হবে শুনেই চাল সে ছেড়ে দিচ্ছে।

কানাই : আপনি নিয়ে এলেন নাকি!

ধনেশ : দু'বস্তা আনলাম বৈকি! বাড়ি গিয়ে গাড়ী দিয়ে ভবেশকে

পাঠাব। ভবেশ ফিরে গিয়ে রমেশকে পাঠাবে; রমেশের পর নরেশ, নরেশের পর সুরেশ, সুরেশের পর দ্বিজেশ। বাস্ সেই শেষ!

চাটুজ্যে : মহাশয়ের নাম?

ধনেশ : ধনেশ। ছ'ভাই রাতারাতি দু'বস্তা করে নিলে বারো দুগুণে চব্বিশ মণ। ঘরে পুরতে পারলে জাপানী হাঙ্গামাটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে। দাও দাদারা এবার আমাকে যেতে দাও।

কানাই : কিন্তু আপনার দু'বস্তা চাল?

ধনেশ : দেখছ না ক্যারিয়ারে বাঁধা আছে।

কানাই : এই মোনা, গাড়ী আটক কর। পরেশ, চাটুজ্যেমশাইকে নিয়ে ক্যারিয়ার থেকে বস্তা খুলে নামা। আমি এই থান ইট নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম বাবুর কাছে—পালাতে চাইবে কি চেঁচাবে, দোব মাথা ফাঁক করে।

ধনেশ : তোমরা ডাকাতি করবে না কি!

কানাই : ডাকাতি কি! পাড়ার ভেতর দিয়ে চাল নিয়ে চলে যাবেন? চালাকি পেয়েছেন? খুলছিস রে শালা পরেশ।

পরেশ : খুলছি রে শালা।

কানাই : মোনা, ড্রাইভার শালা যেন না স্টিয়ারিঙে হাত লাগায়।

ধনেশ : জোর করে তোমরা চাল নেবে?

কানাই : নইলে আমাদের ফ্রী-কিচেন চলবে কি করে?

ধনেশ : ফ্রী-কিচেন! তোমরাও আবার ফ্রী-কিচেন করেছ নাকি?

কানাই : আমাদের ফ্রী-কিচেন আজকার নয়, অনেক দিনের।—চাকরি-বাকরি কস্মিনকালেও করি না, কিন্তু নিত্য তিন বেলা হাঁড়ি চড়ে। বনিয়াদী ফ্রী-কিচেন। নামিয়েছিস রে বস্তা!

পরেশ : হ্যাঁ রে শালা, নামিয়েছি!

কানাই : এই ড্রাইভার, গাড়ী ঘুরিয়ে খালের ধার দিয়ে চলে যাও। উঠুন মশাই, অনেকক্ষণ পথে দাঁড়িয়ে আছেন, গাড়ীতে উঠুন।

ধনেশ : থানায় চল ড্রাইভার।

কানাই : যাবেন না, যাবেন না। বিপদে পড়বেন। আপনার গাড়ীর নম্বর আমি টুকে নিয়েচি। ক্রিমিন্যাল ঠুকে দোব। মানুষ চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছেন। সাক্ষী আমরা আর ওই মেয়ে-ছেলে দু'টি, ওদেরি পথের সাথী।

ধনেশ : ড্রাইভার, খাল ধার দিয়েই শ্রীমন্ত সাধুখাঁর দোকানে চল বাবা। ডাকাতি, রাহাজানি যাই হোক, চাল নিয়ে বাড়ি ফিরতেই হবে।

(মোটরের হর্নের শব্দ দূরে মিলাইয়া গেল)

কানাই : রাতের আয়টা মন্দ হোলো না। চাটুজ্যেমশাই কতটা নেবেন? নগদ টাকা দিতে হবে মনে রাখবেন কিন্তু।

চাটুজ্যে : টাকা কি হে! আমিও যে হাত লাগালাম! আমার বখরা?

কানাই : এ কারবারে আমরা বখরাদার রাখিনে।

মনোহর : এই কানাই, তর্ক করে সময় নষ্ট করিসনি, লোকজন এসে পড়বে।

পরেশ : আড্ডায় নিয়ে চল্। ভাগ-বাঁটোয়ারা সেখানেই হবে।

কানাই : তুই শালা চাটুজ্যেমশাইয়ের মিনুর জন্যে বখরা আদায় করে ছাড়বি ত?

পরেশ : তা চাটুজ্যেমশাই হাত লাগিয়েছিলেন ত।

চাটুজ্যে : বোঝ বাবা, এই বুড়ো বয়েসে—শুধু দু'মুঠো চালের জন্যে।

মনোহর : আর খুব জোর গলায় লোকটাকে ধমকেও দিয়েছিলেন।

চাটুজ্যে : বল, বাবা, বল। লোকটা কেমন ভড়কে গেল।

কানাই : চলুন চাটুজ্যেমশাই, বখরা আপনিও পাবেন।

চাটুজ্যে : তোমাদের জয়জয়কার হোক্ বাবা, জয়জয়কার হোক্।

কানাই : ওরে মোনা, চাল যখন পাওয়া গেল, তখন একটা ভালো কাজ করেই যা। মেয়েছেলে দুটোকে তাদের চালগুলো ফিরিয়ে দিয়ে যা।

পরেশ : সারারাত ওইখানে পড়ে রয়েচে।

মনোহর : চাটুজ্যেমশাই, এই নিন আপনার পয়সা; দিন চাল ফিরিয়ে।

চাটুজ্যে : নাও বাবারা, রক্তমাখা এই চাল।

কানাই : মোনা, শিগ্‌গির শিগ্‌গির দিয়ে আয় চালগুলো ফিরিয়ে, তারপর বস্তাগুলো ধর। আসুন চাটুজ্যেমশাই, আয় রে পরেশ। তোমরা কে হে? পথ রুখে দাঁড়িয়েছ?

উত্তম : আমরা সিভিক গার্ড।

কানাই : আমাদের বস্তা নিচ্ছ কেন?

উত্তম : আমরা নিয়েই থাকি।

পরেশ : খুব যে নবাবের মতো কথা কইছ।

মধ্যম : আমরা কয়েই থাকি।

কানাই : বাঃ রে! বস্তা ঠ্যালায় তুলচ কেন?

উত্তম : কনট্রোলে নিয়ে যাব। চাল চাও যদি, লাইনে গিয়ে দাঁড়াও।

কানাই : তুমি ত আচ্ছা লোক হে! আমাদের কেনা চাল তোমরা জোর করে নিয়ে যাবে কনট্রোলে!

উত্তম : বস্তা ত কনট্রোলে যাবেই, বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোমাদের নিয়ে যাব থানায়।

কানাই : খুব যে লম্বা লম্বা কথা কইছ। তোমার নাম কি?

উত্তম : উত্তম সরকার।

মধ্যম : আর আমি মধ্যম মালো।

পরেশ : দে রে কানু, ব্যাটাদের উত্তম-মধ্যম দিয়ে দে।

উত্তম : সে কিন্তু বে-আইনী কাজ!

কানাই : আমাদের কেনা চাল নিয়ে যেতে চাও কোন্ আইনের জোরে?

মধ্যম : শোন হে। চাল যে তোমাদের কেনা নয়, তা আমরা জানি।

কানাই : তোমারই নাম না বললে মধ্যম মালো?

মধ্যম : হ্যাঁ।

কানাই : তাই ঐ কথা তুমিই বললে।

মধ্যম : খুব ভালো প্রস্তাব করিচি ভাই। একটু সরে এসে শোন।

(মনোহর ফিরিয়া আসিল)

মনোহর : দিয়ে এলাম মেয়েছেলে দুটোকে তাদের চাল ফিরিয়ে। বসে থেকে থেকে হয়রান হয়ে নেতিয়ে পড়েছে। সাড়া দিলে না! তাই থলেটাই রেখে এলাম।

পরেশ : মরে যায়নি ত রে!

মনোহর : তাও যেতে পারে।

পরেশ : ওরে এত রাতে এ-দিকে মড়া, ও-দিকে মড়া—শহর কি শ্মশান হয়ে গেল!

মনোহর : চাটুজ্যেমশাই!

চাটুজ্যে : কে বাবা।

মনোহর : পৈতে আছে আপনার। আমাদের ছুঁয়ে দাঁড়ান। ওরে শালা কানু তোদের পরামর্শ শেষ হোল?

কানাই : এই! এই! ঠ্যালা নিয়ে ছুটে চলেছে যে!

উত্তম : এই ঠ্যালাওলা! থামকে! থামকে রে শালা!

মনোহর : আমাদের বস্তা নিয়ে যায় যে রে।

কানাই : চোর! চোর! পাকড়ো! উত্তম-মধ্যম সিভিকরা ছুটে চল দাদারা, হাতে তোমাদের ব্যাটম আছে। আয় মোনা, আয়রে পরেশ, চাটুজ্যেমশাই আসুন।

চাটুজ্যে : যেয়োনি বাবা পরেশ। এখুনি পুলিস আসবে, মারধর চলবে।

পরেশ : চেয়ে দ্যাখরে মোনা। কালো কালো মানুষের সারি পিল পিল করে ঠ্যালা ঘিরে দাঁড়িয়েচে।

(দূরে অস্ফুট কোলাহল)

ওই দ্যাখ রে মোনা, ঠ্যালাওলারা বস্তার মুখ খুলে আঁজলা ভরে চাল তুলে তুলে ওদের বিলিয়ে দিচ্ছে। জয় হোক্ ওদের, জয় হোক্।

মনোহর : তুই কি পাগল হয়ে গেলি রে পরেশ!

পরেশ : চ্যাঁচানারে শালা।

(দূরে ঘন ঘন পুলিসের বাঁশী)

মনোহর : এইরে পুলিস এসে পড়েছে। ব্যাটা মলো এইবার।

চাটুজ্যে : পালিয়ে আয় বাবা পরেশ। পালিয়ে আয়। আমার মিনু যে পরেশ-দা বলতে অজ্ঞান।

পরেশ : পালিয়ে আয় রে মোনা।

মনোহর : ওই মেয়েছেলে দুটোর কাছ থেকে চালের থলেটা নিয়ে যাব না?

পরেশ : ওরে শালা! ধরা পড়বি, মারা পড়বি। পালিয়ে চল, আসুন চাটুজ্যেমশাই!

(তাহারা চলিয়া গেল। দূরে কোলাহল চলিতে লাগিল)

মোহিনী : মাসি, ফর্সা হয়ে এল।

বিলাসী : হ্যাঁ, ফর্সা হয়ে এল।

মোহিনী : চল বাড়ি যাবি।

বিলাসী : যাবার ডাকও শুনতে পাচ্ছি।

মোহিনী : মিন্সেগুলো আমাদের চাল ফিরিয়ে দিয়ে গেছে মাসি।

বিলাসী : তাদের ভালো হোক্।

মোহিনী : চল তবে উঠি!

বিলাসী : তুই আমায় নিয়ে যেতে পারবি?

মোহিনী : ফেলে যাই কেমন করে?

(বিলাসী খানিকটা উঠিয়া বসিল)

বিলাসী : ওটা কি রে! ওইখানে পড়ে।

মোহিনী : সেই মানুষটা, যার মাথায় তুই ইঁট মেরেছিলি।

বিলাসী : কেন মেরেছিলাম রে!

মোহিনী : চাল কেড়ে নিতে চেয়েছিল যে।

বিলাসী : বলেছিল কাল সকাল থেকে ওর ছেলেপুলে না খেয়ে আছে।

মোহিনী : সে মিছে কথা।

বিলাসী : মিছে কথা খামোকা কেনই বা কইবে। চলত ওর কাছে।

মোহিনী : চল। আবার যেন না মাথায় ইঁট মারিস। এখন ফরসা হয়ে গেছে। লোকজনে দেখে ফেলবে।

বিলাসী : না, না, ইঁট মারবার জোর আর নেই।

মোহিনী : তোর পা কাঁপছে। তুই আর চলতে পারবি নে।

বিলাসী : ওইটুকু পারব।

মোহিনী : তোকে বাড়ি নিয়ে যাব কেমন করে?

বিলাসী : যাবার সময় হলে নিয়ে যাবার লোক হাজির হবে। শুনিসনি, সময়ে তারা দেখা দেয়? এই যে বাছা এইখানেই পড়ে রয়েছে। ওরে মোহিনী!

মোহিনী : কি হোলো মাসি?

বিলাসী : এ যে আমার কামারপাড়ার বোন-পো হারাধন! হারাধন বাবা, আঁধারে ঠাহর করতে না পেরে, এই সর্বনাশ আমি

করিচি। ওঠ বাবা, ওঠ। চাল নিয়ে ঘরে যা! হারাধন! হারাধন!

(অতিকষ্টে চোখ মেলিয়া হারাধন কহিল)

হারাধন : কে?

বিলাসী : আমি তোমার মাসি বাবা।

হারাধন : মাসি! কি বলছ মাসি?

বিলাসী : চাল নিয়ে ঘরে যা বাবা।

হারাধন : চাল্? দেখি চাল কেমন!

(কম্পিত হাত বাড়াইয়া দিল। বিলাসীও কম্পিত হস্তে থলি হইতে একমুঠো চাল তুলিয়া তাহার হাতে দিল। হারাধন চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সেই চাল দেখিতে লাগিল। নবোদিত সূর্যের রশ্মি আসিয়া তাহার মুখে পড়িল। তাহার কম্পিত হাত হইতে চাল গলিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল। তিন চারিটি লোক দৌড়াইয়া আসিল, একজন কহিল :)

প্রথম : এই যে এখানে একথলে চোরাই চাল নিয়ে এরা বসে আছে।

দ্বিতীয় : পাকড়ো, পাকড়ো; পুলিসে দাও, পুলিসে দাও!

বিলাসী : নিয়ে যাবার লোক এসেছে মোহিনী, তোকে আর বোঝা বইতে হবে না।

(লোক তিনটি তিনজনকে ধরিল, কিন্তু দেখিল দুইজন তাহাদের হাতেই ঢলিয়া পড়িল—বিলাসী আর হারাধন। মোহিনী ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাছের একটা দোকানে লাউডস্পীকার রেডিও যন্ত্রে ধ্বনিয়া উঠিল :)

বেতার বাণী : সার এডওয়ার্ড বেন্থল আশ্বাস দিয়াছেন, এখন হইতে প্রতিদিন কলিকাতায় ৯১০ ওয়াগন ভরতি খাদ্য আমদানী হইবে। উহার ফলে ত্রিশ লক্ষেরও অধিক লোক প্রত্যহ দুই বেলায় আড়াই পাউন্ড পুষ্টিকর খাদ্য উদরস্থ করিবার সুযোগ পাইবে। তাহা ছাড়া সুজলা সুফলা দেশমাতৃকার

বুকের দান ত আছেই। সুতরাং অন্নাভাব কল্পনা করিয়া কেহ যেন না দুঃখকে বরণ করিয়া লন।

একজন: আহা! মরবার আগে যদি এরা কথাগুলো শুনতে পেত, খুসি হয়ে মরতে পারত!

(যাহারা চোরাই চালসহ চোর ধরিতে আসিয়াছিল তাহারা বিলাসী আর হারাধনের প্রাণহীন দেহের দিকে চাহিয়া রহিল। ট্রাম, বাস, লরী, গাড়ীর শব্দে রাজধানীর রাস্তায় জীবনের সাড়া জাগিল।)

ক্ষুধা

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

সন্ধ্যা সাতটার সময় জীবনকৃষ্ণ শ্রান্তদেহে আপিস থেকে ফিরলো। সংকীর্ণ বারান্দার একটি কোণ দরমার বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেইটে রান্নাঘর। তারই বাইরে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সন্ধ্যারাণী নিঃশব্দে বসে ছিল। জীবনকে আসতে দেখে একবার সে ক্লান্ত, বিষণ্ণ চোখ তুলে চাইলে। তখনই চোখ নামিয়ে নিয়ে যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইল।

দীর্ঘ কাল থেকে জীবনকৃষ্ণের এই হচ্ছে আপিস থেকে ফেরার পরে স্বাগত-সম্ভাষণ। এতেই সে অভ্যস্ত। এর বেশি আর সে চায়ও না।

জীবন যে ঘরে জামা-কাপড় ছাড়বার জন্যে গেল, সেটি দিনের বেলাতেই অন্ধকার থাকে, এখন তো কথাই নেই। দু'খানি বড় চৌকি ইট দিয়ে-দিয়ে উঁচু ক'রে পাতা। দেওয়াল ঘেঁসে একখানি বেঞ্চ পাতা। তাতে গোটা দুই বাক্স, পানের ডাবর ইত্যাদি আছে। বেঞ্চ আর চৌকির মধ্যে যে ফাঁকটুকু রয়েছে তাতে একজন লোক দাঁড়াতে পারে। একপাশে একটি জানালা, তারের জাল দিয়ে ঘেরা।

এই একখানি ঘর নিয়েই তারা আছে।

পাঁচ-ছ'টি ছেলে-মেয়ে দিয়ে এতে তাদের কুলোয় না। কিন্তু কি করবে! এরই ভাড়া দশ টাকা। এর বেশি বাড়ি ভাড়া দেবার সামর্থ্য জীবনের নেই।

বড় ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সে শোয় চৌকির উপরে। ছোট দু'টিকে নিয়ে সন্ধ্যা শোয় চৌকির নিচে আর একটা নিচু চৌকিতে। একেবারে মেঝেয় শোবার উপায় নেই। এত স্যাঁৎসেঁতে যে দাঁড়িয়ে থাকলে জল ওঠে। বিছানা ভিজে যায়। সেই কারণেই চৌকিটা উঁচু করে ওরা ঘরখানিকে দোতালা করে নিয়েছে।

জীবনকৃষ্ণ জামাটা ছেড়ে বাইরে হাওয়ায় এসে বসলো।

অন্ধকারেই তার মনে হয়েছিল, চৌকির উপর কে যেন শুয়ে। কিন্তু কে শুয়ে, কি হয়েছে তার, এসব জিগ্‌গাসা করতে তার ভয় হয়। ভয় হয়, উত্তরে কী দুঃসংবাদ না জানি শুনবে।

তবু থাকতে পারলে না। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে জিগ্‌গাসা করলে, "ঘরে শুয়ে কে?"

সন্ধ্যা সংক্ষেপে উত্তর দিলে, "মণ্টু।"

—"জ্বর?"

—"হুঁ।"

জীবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। তারপরে রান্নাঘরের দিকে চেয়ে দেখলে। ঘর অন্ধকার। উনানে আগুন নেই। রান্না হচ্ছে না।

জীবন উপরের মেঘান্ধকার আকাশের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইল।

একটু পরে জিগ্‌গাসা করলে, "কয়লা নেই?"

সন্ধ্যা জবাব দিলে না।

—"সেদিন যে গুল দিলে। ফুরিয়ে গেছে?"

—"আছে কিছু। কিন্তু চাল কোথায়?"

জীবন বাড়িটার চারিদিকে একবার চেয়ে দেখলে।

—"ছেলেগুলো গেল কোথায়?"

—"রাস্তায় খেলা করছে।"

—"সন্ধ্যে পর্যন্ত?"

—"আমি পাঠিয়েছি। বাড়ি এলেই তো খেতে চাইবে। খাওয়াব কি?"

জীবন আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে।

তারপরে জিগ্‌গাসা করলে, "বাড়ি চুপচাপ লাগছে? ওরা সব গেল কোথায়?

ওরা মানে অন্য ভাড়াটেরা।

সন্ধ্যা বললে, "কনট্রোলে চাল আনতে।"

জীবন সবিস্ময়ে বললে, "মেয়েরা!"

—"রোজই তো যায়।"

জীবন চুপ করে রইল।

কণ্ঠে বিষ মিশিয়ে সন্ধ্যা বললে, "তোমার মতো সুন্দরী বৌ তো কারও নয়। তোমার মতো বউকে মন্দও কেউ করে না। তাই গেছে। ব্যাটাছেলেদের কাজ আছে। পয়সার জন্যে পাঁচ ধান্দায় তাদের ঘুরতে হয়। কিন্তু শুধু পয়সা হলেই তো হবে না। পোড়া পেটের জন্যে চাল চাই। মেয়েরাই তাই গেছে চালের সন্ধানে। এখুনি চাল আনবে। রাঁধবে, বাড়বে খাবে। আর আমার ছেলেগুলো ক্ষিদের যন্ত্রণায় রাস্তায় ছুটে বেড়াচ্ছে।"

কান্নায় সন্ধ্যার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

স্ত্রীকে সন্দেহ করা জীবনকৃষ্ণের একটা ব্যাধি। আজ সন্ধ্যা অনেক-

গুলি ছেলে-মেয়ের মা। যখন তার ছেলে হয়নি, কিংবা একটি-দুটি ছেলে হয়েছে, জীবন ওকে ঘরে তালা বন্ধ করে আপিস যেত। ওকে নিয়ে কোন একটা বাড়িতে বেশি দিন থাকতে পারত না। বেরালে যেমন ছানাগুলো নিয়ে স্বস্তি পায় না, একবার এখানে, একবার ওখানে লুকিয়ে রাখে,—ও তেমনি সন্ধ্যাকে নিয়ে নিত্য নতুন বাসায় লুকিয়ে রেখেছে।

এখন আর ততখানি করে না। তবু ব্যাধি একেবারে যায়নি। যদি কোন দিন এই একান্ত বিড়ম্বিত জীবনেও সন্ধ্যা কোনো কারণে আনন্দে চঞ্চল হয়ে ওঠে, জীবন সন্দেহে কণ্টকিত হয়। সন্ধ্যার উপর থেকে চোখের পাহারা ও এখনও সরিয়ে নিতে পারেনি।

একটা বড় ব্যারাক বাড়িতে একখানি শয়নকক্ষ ও তৎসংলগ্ন একখানি রান্নাঘর নিয়ে ওরা অনেকগুলি পরিবার থাকে। স্বল্প আয়। বাজার ক'রে চাল-চিনি-কয়লা-কেরোসিন কেনার সামর্থ্য ওদের নেই। প্রথম প্রথম যখন কনট্রোলের দোকান হল তখন পুরুষেরাই যেত। এখনও যায়। কিন্তু দেখা গেল, কনট্রোলের দোকান থেকে একজন লোক যা পায় তাতে সংসার চলে না। অভাব ক্রমেই বাড়তে লাগলো। অবশেষে মেয়েরাও প্রথমে সসংকোচে, শেষে বীরদর্পেই কনট্রোলের দোকানে যেতে আরম্ভ করলে।

কিন্তু জীবনকৃষ্ণ এখনও সন্ধ্যাকে পাঠাতে পারেনি। তার ভয় করে। বাইরে পুরুষের দল হাঙ্গরের মতো ওঁৎ পেতে রয়েছে। সন্ধ্যারও রূপের বাতির সব ক'টি এখনও নিবে যায়নি। অভাবে, অনটনে তার দেহ শীর্ণ, চোখের কোলে কালি পড়েছে। কিন্তু সেই চোখেও মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ খেলে যেতে সে নিজের চোখে দেখেছে। ওর শুষ্ক দেহলতাতেও মাঝে মাঝে অকারণে যেন বসন্তের হিল্লোল খেলে যায়। জীবন এখনও ওকে বিশ্বাস করতে পারে না।

সন্ধ্যার কথায় জীবনের চোখে দপ্ করে সন্দেহের আগুন জ্বলে উঠল। বিষ-তিক্ত কণ্ঠে বললে, "সেজেগুজে টিপ প'রে কনট্রোলের দোকানে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে বুঝি।"

সন্ধ্যার মুখে আসছিল বলে, "হ্যাঁ ইচ্ছে করছে। মাসের মধ্যে দশটা দিন উপোস আর সহ্য করতে পারছি না, শুকনো মুখে ছেলে-মেয়েরা খালি পেটে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এ আর দেখতে পারছি না। মনে হচ্ছে লাথি মেরে সব ভেঙে দিয়ে যেদিকে দু'চোখ যায়, পালাই। অশনে বসনে প্রতিদিনের এই অভিশাপ আমার সহ্যের অতীত হয়ে উঠেছে।"

কিন্তু অতগুলো কথা গুছিয়ে বলার শক্তি তার নেই। দিনের বেলায় সকলের ভুক্তাবশিষ্ট কুড়িয়ে নিয়ে সবে সে খেতে বসেছে এমন সময় বুভুক্ষু ছেলে-মেয়েগুলি হাঁ করে তার থালা ঘিরে এসে দাঁড়ালো। ওদের ক্ষুধা যেন বেড়ে গেছে। পেটে সকল সময় যেন অনির্বাণ আগুন জ্বলছে। কিছুতেই তার তৃপ্তি নেই।

সন্ধ্যার খাওয়া হল না। অর্ধভুক্ত ছেলে-মেয়েগুলোর মুখে পাতের ভাত তুলে দিয়ে সে উঠে পড়লো।

এখন তার মাথা ঝিম ঝিম করছে। তার উপর হাঁড়িতে চালের একটা দানাও নেই। ছেলেগুলো খেলতে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে এল। এখনই তারা ক্ষুধার যন্ত্রণায় হাঁ হাঁ করতে করতে ফিরবে! তাদের মুখে যে কি তুলে দেবে সে, সেও চিন্তা।

সন্ধ্যা জীবনের কথার জবাবে শুধু বললে, "আমাকে আর বিরক্ত কোরো না। আমার কিছু ইচ্ছে করছে না, শুধু দেওয়ালে মাথা ঠুকে মরতে ইচ্ছে করছে।"

সন্ধ্যা টলতে টলতে ঘরের ভিতর গিয়ে ছেলের বিছানায় গিয়ে বসল।

জীবন বারান্দায় ঝিম হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল।

অন্যান্য ভাড়াটিয়াদের মেয়েরা কলরব করতে করতে ফিরলো। তাদের কেউ চাল পেয়েছে, কেউ পায়নি। যারা চাল পেয়েছে তারা খুব ব্যস্ত। এখনি উনান ধরাবে, তারপর রান্না চড়াবে। যারা পায়নি তারা তারস্বরে কেউ কনট্রোলারদের, কেউ বা নিজের অদৃষ্টকে গাল দিতে লাগলো।

জীবন একটুক্ষণ নিঃশব্দে বসে থেকে ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে জীবন ফিরলো। কাপড়ের খুঁটে কিছু চাল। একটা ডালায় কয়েকটা তোলা কয়লা। বহু অনুনয়-বিনয় করে কোন বন্ধুর কাছ থেকে ধার চেয়ে এনেছে। আজকের রাত্রিটা তো চলুক। তারপর কাল সকালে অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।

ক্ষুধায় ক্লান্তিতে সন্ধ্যার তন্দ্রা এসেছিল।

জীবন তাকে ডাকলে। বেচারা সন্ধ্যা! জীবন যে ওর দুঃখ বোঝে না তা নয়। কিন্তু সন্দেহ তার অস্থি-মজ্জা যেন পোকার মতো কুরে কুরে খায়। ও একটা ব্যাধি। তাকে একটা পাশের মতো বেঁধেছে। ওখানে ও অসহায়।

সন্ধ্যাকে ডেকে ও নিজেই উনান ধরাতে বসলো।

বেচারা সন্ধ্যা! একটু ঘুমুক!

সন্ধ্যা উঠে এসে ছায়ামূর্তির মতো ওর পিছনে স্তব্ধভাবে দাঁড়ালো।

উনান ধরাতে জীবন জানে না। অপটু হস্তে তবু চেষ্টা করছে। কখনও ফুঁ দিচ্ছে, কখনও পাখার বাতাস করছে।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সন্ধ্যা বললে, "সর তুমি।"

অপ্রস্তুত ভাবে হেসে জীবন একপাশে সরে দাঁড়ালো।

সন্ধ্যা বললে, "বড় ধোঁয়া। তুমি বাইরে দাঁড়াও। শোবার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিও। ঘরে ধোঁয়া যাবে।"

জীবন বাইরে এল।

বাইরেও ধোঁয়া কম নয়। সমস্ত বাড়ির ধোঁয়া উঠানকে অন্ধকার করে স্তূপে স্তূপে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। চোখ জ্বালা করে, মাথা ঝিম ঝিম করে।

জীবন শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে মণ্টুর বিছানায় গিয়ে বসলো। কী জ্বর ছেলেটার!

বিছানাটা মলিন, শত তালিযুক্ত। তার উপর চাদর নেই। যে কাঁথাটা সে গায়ে দিয়ে আছে সেটাও যেমন ছেঁড়া, তেমনি মলিন, তেমনি দুর্গন্ধযুক্ত। তাইতে সে অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

জীবনের বুকটা ছ্যাঁৎ কর উঠলো!

বেঁচে আছে তো মণ্টু! ভয়ে ভয়ে জীবন ওর বুকে হাত দিলে। না, বেঁচে আছে! হৃৎপিণ্ড ঘড়ির মতো চলছে!

কিন্তু কি চেহারা হয়েছে!

কৈশোরের কমনীয়তার চিহ্নমাত্র মুখে নেই! এই বয়সেই গাল ভেঙে গেছে। তেলের অভাবে মাথার বড় বড় চুল কটা হয়ে গেছে, তাতে জটা পড়েছে।

জীবন আস্তে আস্তে ওর মাথার চুলে হাত বুলোতে লাগলো।

আহা ঘুমুক। জাগলেই ক্ষুধা পাবে। তার চেয়ে বরং ঘুমুক! ঘুমুক!

ইতিমধ্যে বাইরে কলরব উঠল। যারা বাইরে খেলছিল তারা ফিরেছে।

--মা, ভাত দাও। রান্না হয়নি এখনও? বড্ড যে ক্ষিদে পেয়েছে।

সন্ধ্যা কি উত্তর দিলে জীবন শুনতে পেলে না। সে দ্বার খুলে বাইরে গিয়ে ওদের ভিতরে ডেকে নিয়ে এল।

সব এক রকম চেহারা হয়েছে। গাল ভাঙা, চোখ ফুলো ফুলো হলদে। মাথার কটা চুলে জট পড়েছে। শার্ট ছেঁড়া, ফ্রক মলিন, ছোটগুলো একেবারেই দিগম্বর।

জীবন দু'হাতে করে সবগুলোকে জড়িয়ে দুই হাঁটুর মধ্যে টেনে নিয়ে এল।

চুপি চুপি বললে, রান্না প্রায় হয়ে গেছে বাবা। একটু পরেই তোমরা খেতে বসবে। কেমন?

বাপের কাছে এমন আদর ওরা জীবনে পায়নি। ক্ষুধার যন্ত্রণা ভুলে আনন্দে ওরা হাঁটুর মধ্যে নৃত্য করতে লাগলো।

জীবনের মেজ মেয়েটির রং ফর্সা, কিন্তু অযত্নে মলিন। ঘরের মৃদু দীপালোকেও জীবন দেখলে, তার বাঁ চোখের নিচে থেকে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত একটা লম্বা কাটা দাগ।

জীবন বললে, এটা কি করে ছিঁড়লি?

মেয়েটি বললে, জন্তু ছিঁড়ে দিয়েছে।

জন্তু বছর পাঁচেকের ছেলে। অনেক বড় বয়স পর্যন্ত হামাগুড়ি দিয়েছে ব'লে ওকে জন্তু বলে ডাকে।

জীবন বললে, হ্যাঁ রে জন্তু?

জন্তু কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, আমার ভাত খেয়ে দিয়েছে কেন?

জীবন মেজ মেয়েকে বললে, ওর ভাত খেয়ে দিলে কেন?

মেজ মেয়ে বললে, ওর ভাত নয় বাবা। মেজেয় পড়ে ছিল দু'টি দানা ভাত। যেই মুখে দিইছি, ও ছুটে এসে আমার মুখটা এমনি করে আঁচড়ে দিলে।

দু'টি দানা ভাত! তাই নিয়ে ক্ষুধার্ত ভাই-বোনে যুদ্ধ!

জীবন নিঃশব্দে দেওয়ালের দিকে চেয়ে রইল। মলিন দেওয়াল, ম্লান দীপালোক। দেওয়ালে একটি ছেলের ছায়া পড়েছে প্রেতের মতন।

খাওয়া-দাওয়ার পরে ওরা আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লো।

সন্ধ্যা জিগ্‌গাসা করলে, চাল কোথায় পেলে?

অবনীর কাছ থেকে ধার করে আনলাম।

এমন করে ক'দিন চলবে?

কাল সকালে কণ্ট্রোলে যাব।

তাতে সকালবেলাটা চলবে। রাত্রে?

আহারাদির পরে জীবনের মনের উষ্মা অনেকখানি কমেছে। অহো-রাত্রর বীভৎস সমস্যাটিকে এখন কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়।

বললে, সে রাত্রে দেখা যাবে।

সন্ধ্যা বললে, ছেলেগুলোর ক্ষিদের সঙ্গে খাওয়াও বেড়েছে। ওদেরও দোষ নেই। দু'বেলা দু'টি ভাত, তার মধ্যে আর তা কিছু নেই। দুধের অভাবে ছোটগুলোও ভাত খায়। চাল সেজন্য বেশি লাগছে।

জীবন নিঃশব্দে শুনে যেতে লাগলো।

সন্ধ্যা বললে, মণ্টুটার জ্বর তাই, নইলে যে চাল তুমি এনেছ, ওতে সকলের কুলোত না।

সন্ধ্যার গলার স্বর ভারী হয়ে এল।

বললে, মা হয়েও একথা বলতে হল। তুমি কিছু মনে কোরো না। আমার মাথাটা মাঝে মাঝে কেমন করে। মনে হয় পাগল হয়ে যাব বুঝি।

সন্ধ্যা নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

একটু পরে বললে, মা হয়ে ছেলে-মেয়ের খাওয়া দেখছি, তুমি যেন আমায় ঘেন্না কোরো না। ওদের কষ্ট দেখে দেখে আমি যে কী হয়ে গেছি!

সন্ধ্যা আবার কাঁদতে লাগলো।

জীবনের মুখ দিয়ে অনেকক্ষণ পরে একটি সান্ত্বনার কথা বার হোল : তোমার শরীরও তো ভালো নয়।

সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি বললে, আমার কথা ছেড়ে দাও। আমি বেশ আছি। এই দুঃসময়ে পেটে যেটা এসেছে তারই কথা ভাবছি।

গলা নামিয়ে সন্ধ্যা বললে, আজ দু'তিন দিন থেকে সেটা নড়ছে না। পেট যেন আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে।

সে আবার কি?

হ্যাঁ। ভয় হচ্ছে, বোধ হয় বেঁচে নেই।

দুর্ভাবনায় জীবন কাঠের মতো শক্ত হয়ে শুয়ে রইল।

সন্ধ্যা বললে, বাঁচবে কি করে? সপ্তাহে তিনটে দিন আমার না খেয়েই কাটে।

জীবন চুপ করে রইল।

সন্ধ্যারও বোধ করি তন্দ্রা আসছিল। নিস্তব্ধ ঘর যেন থম থম করছে, প্রেত পুরীর মতো।

ঢং ঢং করে সামনের বাড়ির ঘড়িতে বারোটা বাজলো।

মণ্টু শ্রান্ত স্বরে বললে, মা, জল।

সন্ধ্যা ধড়মড় করে উঠলো। বললে, দিই বাবা।

কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে সন্ধ্যা নিয়ে এল। অন্ধকারেই মণ্টু ঢক ঢক

করে এক নিশ্বাসে সমস্ত জল যেন শুষে নিলে।

আপন মনেই সন্ধ্যা বললে, ওঃ! কী তৃষ্ণা!

মুখে বললে, জ্বর কি কমে আসছে মণ্টু?

বিকৃত কণ্ঠে মণ্টু বললে, কি জানি!

মণ্টু ধুপ করে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

সন্ধ্যা তার মাথার বড় বড় চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, ঘুমোও বাবা, ঘুমোও মাণিক, ঘুমোও চাঁদ...

পরের দিন সন্ধ্যার আগে জীবন যখন আপিস থেকে ফিরলো, তখন বাড়ি খালি।

শুধু জন্তু এক কোণে অন্তরালে বসে পরম পরিতোষের সঙ্গে একখানা শুকনো রুটি একটু একটু করে ভেঙে মুখে দিচ্ছিল। তার ক্ষুধা প্রবল। অথচ রুটিখানা শেষ হয়ে যায় এও সে চায় না।

জীবন জিগ্‌গাসা করলে, রুটি কোথায় পেলি রে?

জন্তু সামনের বড় বাড়ির দিকে চোখের ইসারা করে বললে, ওরা দিলে।

দিলে? না, তুই চেয়ে আনলি? তোর মা কোথায়?

কন্ট্রোলে।

জীবনের মাথায় কে যেন হাতুড়ির বাড়ি দিলে। চোখে সন্দেহের হিংস্র আগুন জ্বলে উঠলো।

কন্ট্রোলে! সন্ধ্যা কন্ট্রোলে! হুঁ! মেয়েমানুষের স্বভাব!

জীবন আর জামাও খুললে না। সেই অবস্থাতেই ছুটলো কন্ট্রোলের দোকানে। ওর মাথায় তখন যে-আগুন জ্বলছে, তাতে সন্ধ্যাকে খুন করে ফেলাও অসম্ভব নয়।

ঝড়ের বেগে জীবন ছুটলো।

কন্ট্রোলের দোকান দূরে নয়। দূর থেকেই জীবন দেখতে পেলে, সার বেঁধে মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে। ক্বচিৎ দু'একটি মেয়ের মাথায় ঘোমটা। তা' কি লজ্জাও নেই, সংকোচও নেই। মাথার বুকের কাপড় খুলে গেছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। তাদের ঘিরে কলহের ঘূর্ণিপাক দিয়ে দিয়ে উঠছে।

জীবন ছুটলো।

দূর থেকেই চেনবার চেষ্টা করলে, কোনটি সন্ধ্যা। চিনতে পারলে না।

যখন সে সারের একেবারে কাছে এল, দেখলে সন্ধ্যা ওই সারির মধ্যে নেই। কি হল তার? কোথায় গেল তবে?

হঠাৎ তার লক্ষ্য পড়লো, তার-ই বাসার আর একটি ভাড়াটে বৌ দাঁড়িয়ে। বৌটি তার দিকে দৃষ্টি পড়তেই আধ ঘোমটা টেনে কেঁদে উঠল :

—ও-গো সন্ধ্যা নেই গো!

জীবনের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল :

—নেই? কোথায় গেছে?

—তাকে মটরে করে নিয়ে গেছে গো, হাসপাতালে।

—হাসপাতালে? কেন?

পাশে একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, আপনার স্ত্রী বুঝি?

জীবন যেন হতভম্ব হয়ে গেছে। তার মাথায় কিছুই যেন ঢুকছিল না। গলা শুকিয়ে আসছিল। ঘাড় নেড়ে শুধু জানালে, হ্যাঁ।

—খুব আক্কেল মশাই আপনার! পোয়াতি বৌকে পাঠিয়েছেন কন্ট্রোলে চাল আনতে! চমৎকার!

জীবন বলতে যাচ্ছিল, সে পাঠায় নি। পেটের জ্বালায় ছেলেদের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে সে নিজেই এসেছিল লুকিয়ে। কিন্তু তার গলার স্বর ফুটলো না। সে শুধু বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে ভদ্রলোকটির মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ভদ্রলোকটি বলতে লাগলেন, কী কাণ্ড মশাই! কিউতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ভদ্রমহিলা অজ্ঞান হয়ে যান। সবাই মিলে ধরাধরি করে তাঁকে বাইরে হাওয়ায় নিয়ে আসা হল। অ্যাম্বুলেন্স আসতে-আসতে তিনি মরা ছেলে প্রসব করলেন।

বলে ভদ্রলোক ফুটপাথের একটা জায়গায় আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন। জায়গাটা ড্যালা ড্যালা রক্তে লাল হয়ে রয়েছে।

জীবন শিউরে উঠলো।

তার সম্বিৎ ধীরে ধীরে ফিরে আসছিল। ব্যগ্রভাবে জিগ্‌গ্যেসা করলে, কোথায় নিয়ে গেছে তাকে? কোন্ হাসপাতালে?

ভদ্রলোক হাতের তালু উলটে বললে, তা' কি করে বলব মশাই। কোন্ হাসপাতালে যে বেড খালি পাবে তার তো ঠিক নেই।

না, কিছুই ঠিক নেই। সমস্ত পৃথিবী যেন বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। মানুষের খাওয়া-পরা, বাঁচা-মরা কিছুরই আর ঠিক নেই।

জীবন আবার ছুটলো,—মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দিকে।

ক্ষুধার দেশের যাত্রী

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

গত বৎসর জ্যৈষ্ঠের শেষেই প্রচুর বৃষ্টি হল। আষাঢ়ের মাঝামাঝি সমস্ত জমি আবাদ হয়ে গেল। আউশের চারাগুলি ভাদ্রে আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। চাষীর মনে আনন্দের আর সীমা রইল না। এমন ধান নাকি বহু-দিন হয়নি।

কিন্তু এ আনন্দ বেশি দিন রইল না। কি জানি কি কারণে ধানের গোড়ায় লাল পোকা দেখা দিল। পোকার হাত থেকে ধানগুলিকে রক্ষা করবার জন্যে নুন দেওয়া থেকে আরম্ভ করে বহু চেষ্টা হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শেষ পর্যন্ত আউশ ফসলটা নষ্টই হয়ে গেল।

মানুষের আশা তবু রইল। আউশ গেছে, আমন আছে। সে কী আমন, কী তার শোভা! চাষীকে সে সকাল-সন্ধ্যায় ঘর থেকে মাঠে টেনে আনে শোভা দেখবার জন্যে। লকলকে সবুজ পাতাগুলি পরিপূর্ণ আনন্দে হাওয়ায়-হাওয়ায় দিনরাত্রি দোল খায়। দেখে দেখে চাষীর আর আশ মেটে না। বুড়োরা বলতে লাগলো, বিশ বছরের মধ্যে এমন ধান তারা দেখেনি।

এমন সময় আরম্ভ হল আশ্বিনের ঝড়।

বারোয়ারীতলার মণ্ডপে মা এসেছেন। প্রশস্ত উঠানে শিউলি ফুলে রং-করা বাসন্তী রঙের কাপড় পরে ছেলেরা করছে হুড়োহুড়ি। অশ্বত্থ গাছের ঘন ছায়ায় শানাই তান ধরেছে। শরতের সোনার আলো গাছের শিশিরভেজা পাতায়, মণ্ডপের সোনালি খড়ের চালে, আনন্দ-চঞ্চল ছেলে-মেয়েদের মুখে যেন ঝলমল করছে।

কিন্তু সে ওই একদিন।

সকাল ৯টা থেকে মেঘ করে এল। তারপরে আরম্ভ হল ফিস ফিস বৃষ্টি। ছেলেরা একটু ক্ষুণ্ণ হল। কিন্তু একেবারে দমল না। আশা ছিল বিকেলের মুখে এ বৃষ্টি যাবে থেমে। সন্ধ্যায় চাঁদের আলোয় আবার তাদের খেলা আরম্ভ হবে।

কিন্তু বিকেলেও তেমনি অবস্থাই রইল। সপ্তমী পূজা নির্বিঘ্নে কেটে গেল বটে, কিন্তু মেঘও ছাড়লো না, বৃষ্টিও থামলো না।

দিনটা এই রকমেই গেল।

তারপরে রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হল ঝড়।

সে কী ঝড়! যেন সহস্র দৈত্য একসঙ্গে গর্জন করে উঠল। খড়ের চাল দেওয়ালের বাঁধন ছিঁড়ে যেন উড়ে যেতে চায়। বড় বড় গাছ মাটিতে নুয়ে নুয়ে পড়ে। দীঘির কালো জল যেন লক্ষ সাপের মতো ফণা তুলে শান বাঁধানো ঘাটে মুহুর্মুহু আছাড় খায়। বৃষ্টির ধারা ছুঁচের মতো এসে গায়ে বেঁধে। কত বাড়ি পড়ে গেল, কত গরু-বাছুর মরে গেল। যে বাড়িগুলো পড়লো না সেগুলোতেও ঝড়ের হাতের স্পর্শ রয়ে গেল! যেন একটা প্রকান্ড দৈত্য তার মস্ত বড় হাত দিয়ে মসৃণভাবে দেওয়ালের অর্ধেক মাটি চেঁছে নিয়ে গেছে।

মনে হয়েছিল, এ ঝড় বুঝি থামবে না। এ কালরাত্রি বুঝি আর প্রভাত হবে না। এই মহাপ্রলয়ে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু অবশেষে অনেক বেলায় ঝড় থামলো।

দেখা গেল, মন্ডপের দেবী-প্রতিমা বৃষ্টিতে ধুয়ে গলে গেছে। আর মাঠের পূর্ণ অন্তঃসত্ত্বা ধান একেবারে শুয়ে গেছে।

কৃষকের চোখ ফেটে জল বেরুলো। আউশ গেছে, আমনও গেল।

পৌষে যখন ফসল উঠলো, গয়ারাম হিসাব করে দেখলে সিকি ফসল পাওয়া গেছে। এর থেকে জমিদারের খাজনা দিতে হবে, গত বৎসর যে ধান সে ঋণ করেছিল, দেড় গুণ হিসাবে তা পরিশোধ করতে হবে। বাকি যা থাকবে তার থেকে খাওয়া, পরা, বাজার-হাট করা সবই আছে।

ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গয়ারাম মাথায় হাত দিয়ে বসলো। কি করে সংসার চালাবে সে!

দেখতে দেখতে ধানের দর হু হু করে বাড়তে লাগলো।

পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন তিনটে মাস কোনরকমে গয়ারাম চালালো। চৈত্রে অন্ধকার দেখলে। তার নিজের ধান নিঃশেষ হয়ে গেছে। গ্রামের মধ্যে যাদের অনেক জমি এবং সেই হিসাবে কিছু ধান হয়েছে, তারা নগদ টাকা ভিন্ন ধান দেবে না। ধানের দর উঠেছে বিস্তর। ধান ঋণ বন্ধ।

কোথায় যেন মরুভূমি উঠেছে। সে তার প্রকান্ড শুঁড় বাড়িয়ে যেখানকার যা উদ্বৃত্ত ধান টেনে নিচ্ছে। তবু কিছুতেই তার ক্ষুধা মিটছে না। তার অতলস্পর্শী গহ্বরে সমস্ত শস্য মুহূর্তে মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

গয়ারাম দেখলে, ঋণ বন্ধ। তবু আজকে যদি বা ধান কিনতে পাওয়া

যাচ্ছে, দু'দিন পরে তাও পাওয়া যাবে না। গ্রামে উদ্বৃত্ত এবং অনুদ্বৃত্ত ধানও যা আছে, সেই অদৃশ্য মরুভূমি তার সুদীর্ঘ শুঁড় বাড়িয়ে সমস্ত শুষে নেবে।

দু'বিঘে জমি সে বিক্রি করলে।

সে কি জমি? সে তার পিতৃ-পিতামহের রক্ত, তার সযত্ন-লালিত জননী। দিনের পর দিন তার আলের উপর দিয়ে সে দু'বেলা বিচরণ করেছে। সযত্ন-স্নেহে তাতে সার দিয়েছে, চাষ দিয়েছে, বর্ষায় সারা রাত্রি জেগে তার জল রক্ষা করেছে। শিশুকাল থেকে তার পরে কতই না তার মমতা।

পেটের দায়ে অবশেষে তাই সে বিক্রি করলে তিনশো টাকায়।

নোটগুলো মুঠো করে নিয়ে এসে সে দাওয়ায় উপুড় হয়ে পড়লো।

তার বৌ ক্ষেমঙ্করী ছিল ওঘরে।

ওর পড়ার শব্দ পেয়ে ছুটে এসে ব্যাকুল কণ্ঠে বললে, কি হল গো! ওগো কি হল? অমন করে শুলে কেন?

গয়ারাম একটা কথাও বলতে পারে না। শুধু হাউ হাউ করে কাঁদে, আর মেঝেয় মাথা ঘষে।

ক্ষেমঙ্করীর ভয় হল, গয়ারামের কি শক্ত অসুখ করেছে? ভয়ে সেও কেঁদে উঠলো।

ক্ষেমঙ্করীর কান্নায় গয়ারাম ধীরে ধীরে উঠে বসলো। হাতের মুঠো খুলে নোটগুলোর দিকে চেয়ে আবার সে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো: আমার দু'বিঘে বাকুরিখানা জন্মের মতো গেল রে মাগী, পেটের দায়ে মা-জননীকে আমি বিক্রি করে এলাম।

গয়ারামের সংসার খুব বড় নয়, কিন্তু নিতান্ত ছোটও নয়। বড় ছেলে ননীর বয়স পনেরো-ষোলো। বাপের সঙ্গে চাষে খাটে, স্বাস্থ্যবান। দেখলে মনে হয় চব্বিশ-পঁচিশ বয়স। তার পরেরটি মেয়ে। বছর তেরো-চোদ্দ বয়স। বছর দুই হল তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এখন সে ছ'মাস বাপের বাড়িতে, ছ'মাস শ্বশুর বাড়িতে থাকে।

এর পরের তিনটিই ছেলে। বড়টি দশ-এগারো বছরের। দশটা বাজতে না বাজতে গরু নিয়ে মাঠে যায়। সমস্ত দুপুর গাছের ছায়ায় কড়ি খেলা করে। তিনটের সময় ফিরে এসে স্নান করে খায়। তার পরের দু'টি নিতান্তই ছোট।

এই গয়ারামের সংসার।

গুণতিতে সাতজন। কিন্তু খাটুনীর শরীর, সুতরাং আহারের পরিমাণ বেশি। চালের দর ত্রিশ টাকা। এমন অবস্থায় তিনশো টাকার চালে ওদের ক'দিন যাবে? গয়ারাম অবশ্য ধান কিনেছিল। তার স্ত্রী নিজে তাই থেকে চাল করেছে। সুতরাং তার কিছু সস্তা পড়েছিল।

তবু তাতেই বা ক'দিন চলতে পারে? ক্ষেমঙ্করী হিসাবী স্ত্রীলোক। তবু বৈশাখ মাসটা কোনরকমে টেনেটুনে গেল। জ্যৈষ্ঠের গোড়ার দিকেই ওদের মুখে চিন্তার ছায়া ঘনিয়ে এল। আষাঢ় থেকে কি হবে?

এমন সময় ননী একটা খবর নিয়ে এল।

কোথায় একটা এয়ারোড্রোম হচ্ছে। সেখানে মাটি কাটার জন্যে বহু লোকের দরকার হচ্ছে। ওদের গ্রাম থেকেও অনেকে যাচ্ছে। ননী বললে, সেও যেতে চায়।

ক্ষেমঙ্করীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল:

সে কী কাজ! সে কোথায়? সেখান থেকে যুদ্ধে টেনে নিয়ে যাবে না তো? গ্রামের আর কারা যাচ্ছে?

সংবাদ নিয়ে জানা গেল, সেই এয়ারোড্রোমে কুলী সংগ্রহ করার জন্যে কে নাকি একজন এসেছে। মজুরী দেবে অনেক বেশি। গ্রামে বসে উপোস করার চেয়ে সে অনেক ভালো। অনেকেই নাকি যেতে রাজি হয়েছে।

গয়ারাম চুপ করে রইল। গ্রামে থাকলে যে উপোস অনিবার্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু গয়ারামের সাতপুরুষে কেউ কখনও মজুর খাটেনি। ঘরে কিছু জমি আছে, কিছু জমি ভাগে নেয়, হালের গরু আছে, চাষবাস করে, খায়। এই এতকাল ধরে চলে আসছে। এতখানি গয়ারামের বয়স হয়েছে, এর মধ্যে মাত্র একবার সে ট্রেনে চড়েছে।

সেই গয়ারামের ছেলে আজ চললো কুলিগিরি করতে, কোথাকার এয়ারোড্রোমে কে জানে? সামনে বর্ষাকাল। তালের পাতায় ঝর ঝর হাওয়া দেবে। মেঘ আসবে আকুল করে। খাল-বিল-মাঠ যাবে ভেসে। পথের সংকীর্ণ জলে উজান বেয়ে পাউসে মাছ চলবে শির শির করে। কে জানে, তখন কোথায় থাকবে ননী। কে জানে, সে ফিরবে কি না।

ক্ষেমঙ্করী কাঁদতে লাগলো। গয়ারাম স্তব্ধ হয়ে রইল। কিন্তু ননী চলে গেল। সে জানে, ধান যা আর আছে, মা যদি একবেলা উপোস করেও থাকে, তবু আর তিনটে সপ্তাহের বেশি চলবে না। বর্ষায় চাষের কাজ?

কিন্তু বাইরে থেকে সে যদি টাকা রোজগার করে পাঠাতে না পারে, তাহ'লে যে ক'বিঘে জমি আছে, তাও থাকবে না।

ননী চলে গেল। বলে গেল, চাষের আগেই সে ফিরে আসবার চেষ্টা করবে।

ক্ষেমঙ্করী ক'দিন খুব কাঁদতে লাগলো।

গয়ারাম তাকে সান্ত্বনা দিলে, ভয় কি! বেটা ছেলে, তাও একা নয়, গ্রামের বহু লোক গেছে। চাকরী করতে এমন কি লোকে যায় না? মনে কর না কেন, ননী চাকরী করতে গেছে।

মনে করা কঠিন নয়। তবু ক্ষেমঙ্করীর মন মানে না। ক্ষেমঙ্করী কাঁদে, হেঁসেলের কোণে থালা সাজিয়ে ব'সে।

গয়ারাম সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু মন তারও মানে না। সেও কাঁদে, লোক-চক্ষুর অন্তরালে, মাঠে, ন্যাড়া বটগাছের তলায় ব'সে।

চালের পরিমাণ দ্রুতবেগে কমে আসে। ধীরে ধীরে ওদের শোকও কমে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে স্বামী-স্ত্রীতে আলোচনা করে, এইবারে ননীর টাকা আসবে, এক কুড়ি, দু'কুড়ি, যাই হোক।

সকালে কয়ালকে উঠে জিগ্‌গাসা করে, কিছু ধানের দরকার হবে যে হে'

তা দোব। কিন্তু নগদ টাকা লাগবে।

গয়ারাম মৃদু হেসে উত্তর দেয়, টাকার জন্যে ভাবনা কি হে' ননীর টাকা তিন-চার দিনের মধ্যেই আসবে।

কিন্তু তিন-চার দিন দূরের কথা তিন-চার সপ্তাহেও এল না।

যখন মাসখানেক কাটলো, তখন ওদের উদ্বেগের সীমা রইল না। ননী বেঁচে আছে তো? সংসারের অবস্থা সে নিজের চোখে দেখে গেছে। বেঁচে থাকলে নিশ্চয় সে টাকা পাঠাতো।

আশ্চর্য এই যে, শুধু ননী নয়, এ গ্রাম থেকে যারা গেছে তাদের কারও টাকা আসছে না!

গ্রামের বিজ্ঞ ব্যক্তিরা শিরঃসঞ্চালন করে মৃদু হেসে বললেন, বুঝতে পারা গেছে!

অর্থাৎ তারা যুদ্ধে গেছে। উত্তর আফ্রিকায় অথবা বর্মা সীমান্তে। তাদের আশা ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

খবরটা ঘুরতে ঘুরতে যথাসময়ে গয়ারাম এবং ক্ষেমঙ্করীর কানেও

পেীছুলো। কথাটা তাদের মনে লাগলো। এই রকমই একটা কিছু হবে নিশ্চয়। নইলে তারা চিঠিই বা দেবে না কেন, টাকাই বা পাঠাবে না কেন? খবরটা শুনে তারা শয্যা নিলে।

কিন্তু দীর্ঘক্ষণ শোক করার সময়ও নেই।

চাল ক'দিন থেকেই বাড়ন্ত। থালা-বাটি বন্ধক দিয়ে ক্ষেমঙ্করী ক'টা দিন চালিয়েছে। চালিয়েছে মানে, নিজেরা আধপেটা খেয়ে ছেলে-মেয়েদের খাইয়েছে। কিন্তু দরিদ্র কৃষকের ঘরে তৈজসপত্র কতই বা থাকে? আর চালের যে দর, তাতে সেই তৈজসপত্র বন্ধক দিয়ে ক'দিনই বা চলতে পারে?

আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহেই একদিন সকালে শোকে জীর্ণ এবং অনাহারে অবসন্ন ক্ষেমঙ্করী গয়ারামের সামনে এসে দাঁড়ালো।

প্রায় মাসখানেক থেকে ওদের দু'জনের দেখা নেই বললেই চলে। দিনের অধিকাংশ সময় গয়ারাম বাইরে বাইরেই থাকে। খাওয়ার সময় কোনোদিন শাক-ভাত, কোনোদিন নুন-ভাত যা পায়, নিঃশব্দে মাথা নিচু করে খেয়ে উঠে পড়ে। রাত্রে মাঝে মাঝে ক্ষুধা নেই বলে সকাল সকাল শুয়ে পড়ে। ক্ষেমঙ্করী কোনোদিন জোর করে উঠিয়ে খাওয়ায়, কোনোদিন আর বিরক্ত করে না।

শোকে ও অনশনে শুধু যে ক্ষেমঙ্করীর দেহই কংকালসার হয়েছে তা নয়, গয়ারামের দেহও সেই রকমই। দুঃখ দু'জনেরই সমান। তাই পরস্পর পরস্পরকে এড়িয়ে চলে। পরস্পরের চোখের দিকে চাইতে ভয় করে, পাছে দু'জনেই কান্নায় ভেঙে পড়ে।

ক্ষেমঙ্করী যখন এসে দাঁড়ালো, গয়ারাম তখন শূন্যদৃষ্টিতে গরুগুলির দিকে চেয়ে ছিল।

সেগুলিরও চেহারা মনিবের মতোই কংকালসার। খোল অনেকদিনই বন্ধ হয়েছে, সম্প্রতি খড়ও শেষ হয়েছে। এখন দিনের বেলাটা তাদের মাঠে চরিয়ে আনা হয়। রাত্রে চালের খড় টেনে প্রত্যেককে দুটো দুটো করে দেওয়া হয়। তাতে তাদের পেট ভরে না। আগে ফেন পেতো; এখন তা ছেলেগুলোই নুন দিয়ে খায়, গরুতে পাবে কি?

এর উপর ননীর খবর নেই।

পাইকের গরু খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। চড়া দরেই কিনছে। গ্রামের কেউ কেউ বিক্রিও করেছে। গয়ারামের কাছেও তারা এসেছিল। কিন্তু

শুনেই সে শিউরে উঠেছিল। গরু যে কারা কিনছে এবং কিসের জন্যে কিনছে, তা সে জানে। তার মঙ্গলা-বুধী, তার অমন বড় বড় হালের গরুগুলির সে অবস্থা কল্পনা করতেও তার বুকের ভিতরটা হাহাকার করে ওঠে!

এমন সময় ক্ষেমঙ্করী নিঃশব্দে ছায়ামূর্তির মতো এসে দাঁড়ালো।

গয়ারাম জিগ্‌গাসা করলে, কি?

ক্ষেমঙ্করী বললে, গরু কিনতে এসেছিল, দিলে না কেন?

—গরু! কারা কিনতে এসেছিল জানিস?

—কি দরকার জেনে? তোমার ছেলে-মেয়ে খেতে পাচ্ছে না, তোমার টাকার দরকার। গরু নিয়ে ওরা যাই করুক, ওদের বেচলে না কেন?

ক্ষেমঙ্করীর কোটর-প্রবিষ্ট চোখ দিয়ে যেন আগুন বার হচ্ছিল। ওর শীর্ণ দেহ টলছিল। গোয়ালঘরের দেওয়ালে ও ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো।

গয়ারাম চোখ কপালে তুলে বললে, মাগী বলে কি! গরু ওরা যুদ্ধে পাঠাবে জানিস?

—পাঠালেই বা! তোমার ছেলেই যদি যুদ্ধে যেতে পারে, ওগুলো গেলেই বা কি হবে?

গয়ারাম হাঁ করে ওর চোখের দিকে চেয়ে রইল।

ক্ষেমঙ্করীর চোখ দিয়ে হঠাৎ টপ করে একফোঁটা জল পড়লো।

বললে, কিন্তু এইখানে আদর করে বেঁধে রাখলেই কি ওরা বাঁচবে?

ক্ষেমঙ্করী আঁচলের খুঁট তুলে দেখালে। বললে, এককুড়ি দশ টাকায় মঙ্গলাকে বিক্রি করেছি। তুমি বাধা দিও না, দিলে আমি অনর্থ করব।

টলতে টলতে সে বাড়ির ভিতর চলে গেল।

অভিভূতের মতো গয়ারাম সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরে তারই চোখের সামনে দিয়ে পাইকের মঙ্গলাকে খুলে নিয়ে চলে গেল।

এক মুহূর্তের জন্যে গয়ারাম যেন চোখে অন্ধকার দেখলে। এক মুহূর্তের জন্যে তার পায়ের তলার মাটি যেন দুলে উঠলো। তারপরে সে ধীরে ধীরে মাঠের দিকে চলে গেল। তার মঙ্গলাকে বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া গেল, তই দিয়ে ক্ষেমঙ্করী এখনি চাল-ডাল-নুন-তেল কিনে আনবে! সেই অন্ন পেটে পুরতে হবে, একথা মনে করতেও তার গা পাক দিয়ে উঠলো!

শেষ অপরাহ্ণ পর্যন্ত গয়ারাম মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ালে।

বেশি ঘোরবার শক্তি তার নেই। একবার খানিকটা ঘোরে, একবার

বসে। আশ্চর্য এই যে, এর মধ্যে কেউ তাকে একবার খুঁজতে এল না। সন্ধ্যার কিছু আগে সে নিজেই বাড়ি ফিরলো।

ক্ষেমঙ্করী নিঃশব্দে তাকে তেল-গামছা দিলে। গয়ারাম বাড়ির নিচের ডোবা থেকে স্নান করে এল। কচি কলাপাতায় ক্ষেমঙ্করী তাকে ভাত বেড়ে দিয়ে অনেক দিন পরে তার পাতের কাছে বসলো। অনেক দিন পরে গয়ারাম পেট পুরে খেলে।

এমনি করে সেদিনটা কাটলো।

এমনি করে একে একে সব কটি গরুই বিক্রি হয়ে গেল। এবার আর ক্ষেমঙ্করী নয় গয়ারাম নিজেই অনেক দরদস্তুর করে বেশ চড়া দামে বেচলে। কেবল হালের গরু জোড়া রাখলে। চাষের সময়। দু'বিঘে জমি এখনও তার রয়েছে।

খাওয়ার চাল কেনা তো আছেই, তা ছাড়াও বীজ ধান কেনা থেকে আরম্ভ করে চাষের অনেক খরচও আছে। এ সময় গরু বিক্রির এই টাকাটা তার অনেক কাজে লাগলো। মনটা তার অনেক প্রফুল্ল হল। কিন্তু দু'তিন মাস অর্ধাশনের ফলে এই বয়সে শরীরটা তার ভেঙে গেছে। কিছুতে সে কাজে জোর পাচ্ছে না। এ সময় ননী যদি থাকতো।

বৃষ্টি এবার সময়েই হয়েছে। চাষের কাজও সকালেই আরম্ভ হয়ে গেল। গয়ারাম একা। তবু সাধ্যের অতিরিক্ত খেটে সে জমিগুলি সব আবাদ করে ফেললে। শ্রাবণ-মেঘের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে ভরসা জাগলো।

এমন সময় এল বন্যা।

এমন বান গয়ারাম তার জীবনে দেখেনি। সকালে খবর এল বাঁধ ভেঙে দামোদরের বান ছুটেছে ঘোড়ার বেগে, মাঠ-গ্রাম সব ভাসিয়ে। মানুষ কতক ভয়ে, কতক আশায় রইল। হয়তো এতদূর পর্যন্ত আসবার আগেই বান কমে যাবে।

দুপুরে দেখা গেল, রেল লাইনের ধার পর্যন্ত বান এসেছে। পুলের ভিতর দিয়ে তার ঘোলা জলের কিছুটা এপারেও এসেছে!

মানুষ তবু আশা ছাড়ে না। উঁচু রেল লাইন বাঁধের মতো দাঁড়িয়ে। তার জন্যে ওপারের গ্রামগুলির অবশ্য চিহ্ন থাকবে না। কিন্তু এপারের গ্রামগুলি বেঁচে গেলেও যেতে পারে।

হু হু করে বান বাড়ে, ইঞ্চির পর ইঞ্চি। লোকেরা যায়, দেখে আসে। কাঠি পুঁতে জল কতখানি বাড়ছে হিসাব করে। ফিরে এসে গ্রামের লোকদের

খবর দেয়। কেউ বাড়িয়ে বলে, কেউ বা কমিয়ে।

যে যাই বলুক, এ বিষয়ে কারো মনে সংশয় রইলো না যে, জল বাড়ছে। বিকাল পর্যন্ত পুলের ফাঁক দিয়ে যে জল এল তাতেই দক্ষিণ মাঠের অনেকখানি ডুবে গেল।

গয়ারাম উদ্বিগ্ন মুখে ক্ষেমঙ্করীকে বললে, তোকে বাপের বাড়ি রেখে আসি চল। বানের অবস্থা ভালো বোধ হচ্ছে না। ছেলেপুলে নিয়ে ক'দিন সেখানে থাকবি। বান কমলে আবার নিয়ে আসব। কি বলিস?

—তুমি?

গয়ারাম হা হা করে হেসে বললে, আমি কোথায় যাব? ঘর রইল, বাড়ি রইল, জমি রইল, এ সব দেখবে কে?

ক্ষেমঙ্করী চুপ করে রইল।

সে কচি মেয়ে নয়। গিন্নী-বান্নী ছেলেপুলের মা। বাপ-মাও কবে মারা গেছে। এই দুর্বৎসরে ছেলেপুলে নিয়ে ভায়ের বাড়ি গিয়ে দাঁড়াতেও তার ইচ্ছা করে না। সেই বা কোত্থেকে খাওয়াবে? তার অবস্থাও মোটেই ভালো নয়। এই দুর্বৎসরে সেই যে কি করে চালাচ্ছে কে জানে?

গয়ারাম আবার বললে, কি বলিস? যাবি?

ক্ষেমঙ্করী বললে, ন্ না।

—তবে থাক্। যা হয় এক সঙ্গেই হবে। তাই হোল।

রাত্রি ন'টার সময় দেখা গেল, রেল লাইনের উপর পাঁচশো আলো ছুটোছুটি করছে। দূর থেকে সে একটা দৃশ্য। চারিপাশের পাঁচখানা গ্রামের লোক সেখানে জুটেছে। তাদের কলরব দূর গ্রাম পর্যন্ত আসছে, বন্যার কলকল শব্দের সঙ্গে। জল তখন লাইনের অর্ধেক দূর উঠেছে এবং ক্রমেই বাড়ছে।

রাত্রি যখন বারোটা তখন দেখা গেল, আলোগুলো রেল লাইন থেকে ছুটে গ্রামের দিকে পালিয়ে আসছে। রেল লাইন ডুবতে আর হাতখানেক মাত্র বাকি আছে। গ্রাম রক্ষা হওয়া অসম্ভব।

গয়ারামের সম্বল বেশি নয়। টাকা ক'টা সে কোঁচড়ে ভালো ক'রে বেঁধে নিলে। এই রাত্রে অন্ধকারে পালাবার উপায় কোথায়? তার বাড়ি-ঘর, জমি-জায়গা ছেড়ে পালাবেই বা কোথায়? দামোদরের বান,—আসতেও যতক্ষণ, যেতেও ততক্ষণ।

মই দিয়ে গয়ারাম আগে ক্ষেমঙ্করীকে চালের উপর তুললে। তারপর

ছেলে-মেয়েদের। চাল-ডাল-নুন-তেলের হাঁড়িগুলোও তুললে। সবশেষে নিজে। হালের বলদের গলার দড়ি দিলে খুলে। তাদের জান্তব বুদ্ধিতে কি করে যেন বিপদের বার্তা আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। দড়ি খুলে দেওয়া মাত্র অন্ধকারে তারা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

অন্ধকার রাত্রি। গোটা গ্রামের চালে চালে দুশো আলো জ্বলছে। ভয়ে ছেলে-মেয়েগুলো স্তব্ধ হয়ে গেছে। বান আসছে কলকল খলখল শব্দে।

তিন-চার দিন পরে সাহায্য সমিতির ছেলেরা যখন ওদের উদ্ধার করতে এল নৌকা নিয়ে,—বৃষ্টিতে ভিজে, রৌদ্রে পুড়ে, ওদের রং হয়েছে মড়ার চামড়ার মতো। চোখের দৃষ্টি পাগলের মতো,--উদ্‌ভ্রান্ত নিষ্ঠুর, হিংস্র।

সমিতির ছেলেরা ওদের খাওয়ালো।

গ্রামের থেকে শীঘ্র বান সরে যাওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই। ফসল হবার আশাও সুনিশ্চিতভাবে শেষ হয়েছে। কী করবে ওরা আর গ্রামে থেকে! চালের উপর থেকে দিগন্ত বিস্তৃত থৈ থৈ লাল জলের দিকে চেয়ে ওরাও সে কথা বুঝলে।

তারপর সপরিবারে সমিতির নৌকায় গিয়ে উঠল। ক্ষেমংকরী, ছেলে-মেয়েরা, সব শেষে গয়ারাম।

দুলে দুলে নৌকা চললো।

কোথায়? *কে জানে!*